ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি গৃহের ন্যায়। যার একাংশ অপরাংশকে শক্তিশালী করে। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করলেন’ *(বুখারী হা/৪৮১)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

২৯তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২৬

মক্কা চুক্তি

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত

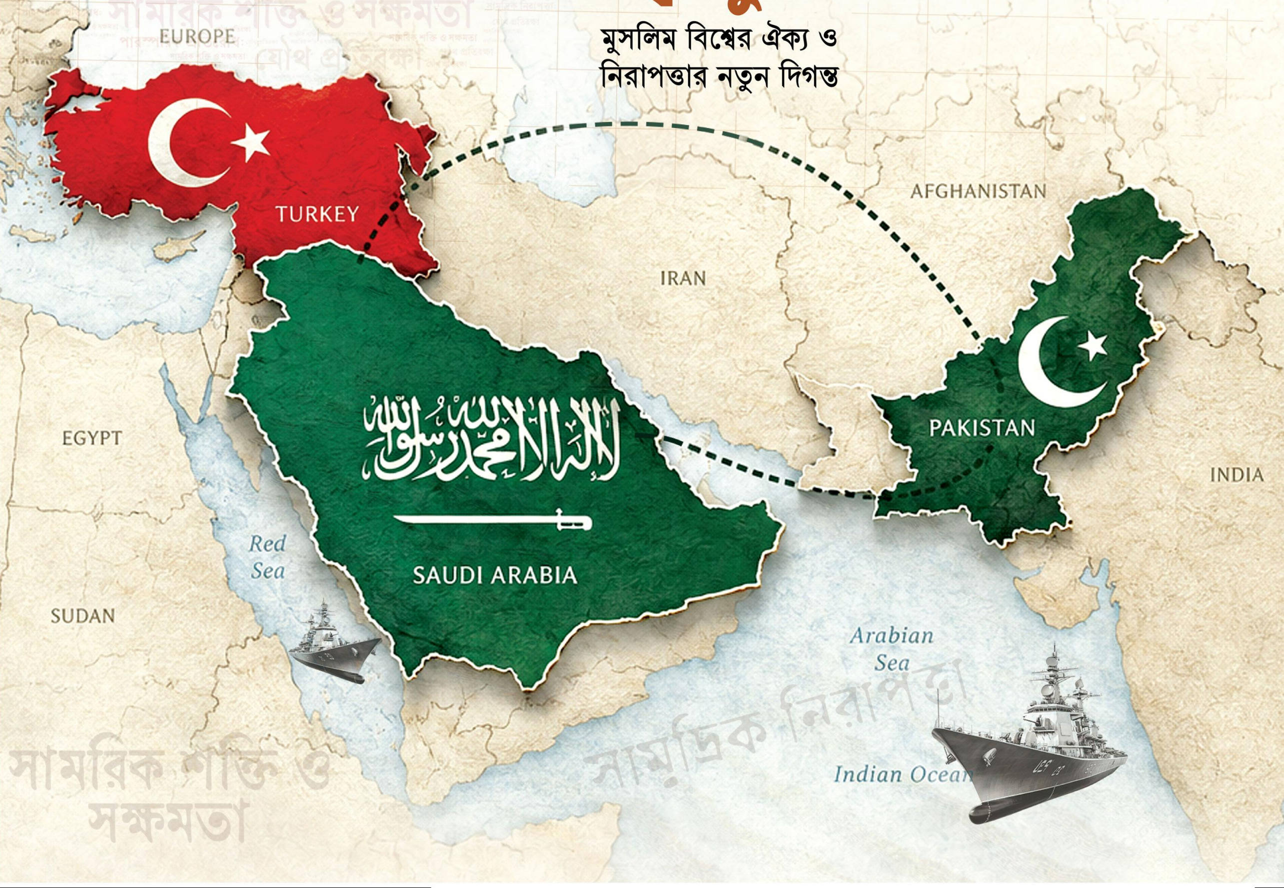

PRESIDENT HOMES LTD.

PRESIDENT GROUP
Way to enjoy in touch...

find your DREAM HOME

book now

BASHUNDHARA

PROJECT NAME :
President Dokkhina

PROJECT LOCATION :
Plot-3260, Road-15, Block-M
Bashundhara R/A, Dhaka-1229

LAND ORIENTATION :
3 Katha & South Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+06 (07 storied building)

FLAT SIZE :
1550 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
06 Nos

JOLSHIRI

PROJECT NAME :
President Noor Ashiyana

PROJECT LOCATION :
Plot-043, Road-506, Sector-16
Jolshiri Abashon

LAND ORIENTATION :
5 Katha & East Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)

FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
08 Nos

JOLSHIRI

PROJECT NAME :
President Khonikaloy (Lake View)

PROJECT LOCATION :
Plot-018, Road-513, Sector-11
Jolshiri Abashon

LAND ORIENTATION :
5 Katha & South Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)

FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
08 Nos

PROJECT NAME :
President Halim's Dream

PROJECT LOCATION :
Plot-065, Road-304, Sector-11
Jolshiri Abashon

LAND ORIENTATION :
5 Katha & South Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)

FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
08 Nos

LAND WANTED

for joint venture development

AT ANY PRIME LOCATION
IN DHAKA CITY

01711-722 301 | 01711-750 638

www.president-group.com | www.presidenthomes.net

بسم الله الرحمن الرحيم

ISSN : 3105-4137

মাসিক

আত-তাহরীক

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ **১২তম সংখ্যা**

রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের ১৪৪৮ হি.
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩৩ বাং
সেপ্টেম্বর ২০২৬ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
একাউন্ট নং : Masik At-Tahreek, 00712200 00115, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
  (বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - মক্কা চুক্তি : মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সম্মিলিত নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - সালাফে ছালেহীন যেভাবে রিয়া থেকে বেঁচে থাকতেন ০৩
    -ড. নূরুল ইসলাম
  - ডারউইনবাদ : বিজ্ঞানের আড়ালে নাস্তিকতার রাজনীতি ০৯
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - হাদীছ অনুযায়ী আমল ১৪
    - মূল (ফার্সী) : মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী
    - অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ফজর ছালাতের গাফিলতি : পরিণাম ও প্রতিকার ১৭
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - জবাবদিহিতা : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের অন্যতম ভিত্তি ২৫
    -মামূন বিন হাশমত
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - ঘুমহীন রাত, বিধ্বস্ত প্যারেন্টিং *-জাহিদ হাসান* ৩১
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - আদর্শের শক্তিতে নিয়মের পূর্ণতা *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩৫
- **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
  - ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আবুবকর ও ওমর (রা.) ৩৭
    -ড. নূরুল ইসলাম
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - মানুষ *-মুস্তাফীযুর রহমান* ৩৮
- **স্বাস্থ্যকথা :**
  - টুথব্রাশ ব্যবহারে অসাবধানতায় হ'তে পারে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস ৪০
- **কবিতা :**
  - কাদা নয়, কাঁধে কাঁধ
  - স্টেশন ৪১
  - বিচারের পাল্লা
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
- **মুসলিম জাহান** ৪৩
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৬
- **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সেপ্টেম্বর ২০২৬

সম্পাদকীয়

২৯তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

মক্কা চুক্তি : মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সম্মিলিত নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত

৭ই আগস্ট ২০২৬ শুক্রবার। বিশ্বের ভূ-রাজনীতি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে পবিত্র মক্কা নগরীর আছ-ছাফা প্রাসাদে মুসলিম বিশ্বের তিন প্রধান শক্তি সঊদী আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে ঐতিহাসিক 'মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি' (Makkah Joint Defence Agreement)। মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্বস্থানীয় দেশ সঊদী আরব, একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং ন্যাটোভুক্ত সর্বাধুনিক সামরিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাসম্পন্ন দেশ তুরস্কের এই ত্রিদেশীয় পদক্ষেপ উম্মাহ্র যৌথ নিরাপত্তা ভাবনায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম দেশগুলোর ধারাবাহিক চিত্র ছিল বিচ্ছিন্ন সামরিক নীতি, অস্থিতিশীল আঞ্চলিক রাজনীতি এবং বহিরাগত শক্তির ওপর অতিনির্ভরশীলতা। কিন্তু এর বিপরীতে বহুল কাংখিত এমন একটি চুক্তি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য একটি আত্মনির্ভর ও সুসংগঠিত যৌথ নিরাপত্তা কাঠামোর দিকে অত্যন্ত ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়। এজন্য আমরা এই ঐতিহাসিক উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমা ও প্রতিবেশী দেশের একাধিক গণমাধ্যম সমূহে বেশ আতংকিত প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তারা এটিকে সরাসরি 'ইসলামী ন্যাটো' বলে অভিহিত করেছে। যদিও মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার যে অনৈক্যের ধারা চলমান, তাতে সেটা কষ্টকল্পনা বা অতিরঞ্জনই বটে। বরং এটি একটি ত্রিপক্ষীয় যৌথ প্রতিরক্ষা সমঝোতা, যা ভবিষ্যতে মুসলিম দেশগুলোর জন্য একটি সুসংগঠিত সম্মিলিত নিরাপত্তা কাঠামো গঠনের প্রারম্ভিক সূচনা হ'তে পারে। কিন্তু প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় এই যে, পশ্চিমা কিংবা অমুসলিম দেশগুলো ন্যাটো (NATO), কোয়াড (QUAD) কিংবা অকাস (AUKUS)-এর মতো একের পর এক সামরিক ও প্রতিরক্ষা জোট গঠন করলে তা আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও পবিত্র স্থানগুলোর সুরক্ষায় যৌথ পদক্ষেপ নিলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ মূলত সমস্যাটি কোন সামরিক হুমকির নয়; বরং মুসলিম বিশ্ব নিজস্ব ধর্মীয় ও কৌশলগত অবস্থান থেকে কোন ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করুক, এটা তারা চায় না।

মক্কা চুক্তির মূল স্তম্ভ হ'ল এর পারস্পরিক প্রতিরক্ষা নীতি। অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত যেকোন একটি সদস্য রাষ্ট্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ বা অন্যায্য আগ্রাসনকে বাকি সব সদস্যের ওপর আক্রমণ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষার মাধ্যমে তা প্রতিহত করা হবে। এটি সম্পূর্ণ একটি রক্ষণাত্মক বা প্রতিরক্ষামূলক জোট (Defensive Alliance), যার মূল উদ্দেশ্য হ'ল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা সুসংহত রাখা, পবিত্র মক্কা ও মদীনাসহ উম্মাহর পবিত্র স্থানগুলোর নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, সন্ত্রাসবাদ দমন, মানবিক সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং যৌথ সামরিক মহড়া, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও ড্রোন, আকাশ প্রতিরক্ষা, নৌ-প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে যৌথ গবেষণা ও প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা প্রভৃতি।

মুসলিম দেশগুলোর এই আত্মচেতনা আমাদের প্রশান্তি দেয়। কেননা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে-ইমরান ৩/১০৩)*। পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি স্পষ্ট করে রাব্বুল আলামীন আরও নির্দেশ দেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ৫/২)*। আল্লাহ মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চিরন্তন ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

এমনকি বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় সাধ্যমতো সামরিক শক্তি ও প্রস্তুতি অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা কাফেরদের মোকাবিলায় সাধ্যমত শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের এবং অন্যদের যাদেরকে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ তাদের জানেন' *(আনফাল ৮/৬০)*। ঐতিহাসিকভাবেও দেখা গেছে, উম্মাহর প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা নিহিত ছিল তাদের আদর্শিক সংহতি ও সামরিক নিরাপত্তার মধ্যে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে মুসলিম বিশ্ব যখনই তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখনই তারা নিজেদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিল। আমরা মনে করি, মক্কা চুক্তিকে একটি সীমিত চুক্তি থেকে উম্মাহর টেকসই নিরাপত্তা ও সংহতির মডেলে পরিণত করার জন্য নিম্নোক্ত প্রত্যাশাগুলো বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত যরূরী। যেমন : ১. মক্কা চুক্তি যেন শুধু তিন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এবং ধীরে ধীরে মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ সক্ষম ও আগ্রহী মুসলিম দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার পথ তৈরী করা হয়। ২. একে একটি স্থায়ী যৌথ প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে, যাতে একক কোন বহিরাগত পরাশক্তির ওপর নিরাপত্তা-নির্ভরতা কমিয়ে মুসলিম দেশগুলোর নিজস্ব প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ৩. ওআইসি (OIC)-কে কার্যকর নিরাপত্তা ও কৌশলগত সহযোগিতার প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা।

২০১৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পবিত্র মক্কা ও মদীনার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সঊদী নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবিরোধী 'ইসলামিক মিলিটারি কাউন্টার টেররিজম কোয়ালিশন' (IMCTC) জোটে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের দায়িত্বশীল অবস্থান স্পষ্ট করেছিল। অতঃপর বর্তমান এই চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর তুর্কী দৈনিক 'ইয়েনি শাফাক' একটি বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে, যেখানে এই চুক্তির সাথে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার জোর সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কীভাবে এমন একটি পদক্ষেপ ঢাকার পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভারতের সাথে সম্পর্কের সমীকরণকে নতুন রূপ দিতে পারে। এতে আশা করা হয়েছে যে, এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ঢাকা এক পরিপক্ক ও বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং তুর্কী জাহায নির্মাণ প্রযুক্তি ও পাকিস্তানের সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা মিলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করতে পারে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। *[বাকী অংশ ৩০ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

www.at-tahreek.com

সালাফে ছালেহীন যেভাবে রিয়া থেকে বেঁচে থাকতেন

-ড. *নূরুল ইসলাম*

রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গোপন একটি রোগ। এটি মানুষের অন্তরে এমনভাবে প্রবেশ করে যে, অনেক সময় আমলকারী নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। এজন্যই সালাফে ছালেহীন রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতেন। শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ (রহঃ) বলেন, الرِّيَاءُ أَخْوَفُ عَلَى الصَّالِحِينَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ 'দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও রিয়া নেককারদের জন্য অধিক ভীতিকর'।[১] তাঁরা নিজেদের আমলকে নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগতেন না; বরং আমল করার পর তা কবুল হবে কি-না এই আশঙ্কায় নিজেদের অন্তরকে পরীক্ষা করতেন। গোপনে ইবাদত করা, মানুষের প্রশংসা থেকে দূরে থাকা, নিজের নেক আমল গোপন রাখা এবং নিয়তকে বারবার সংশোধন করা ছিল তাঁদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সালাফে ছালেহীন যেভাবে রিয়া থেকে আত্মরক্ষা করতেন

১. নিয়তের পরিশুদ্ধিতা অর্জন :

সালাফে ছালেহীনের কাছে ইখলাছ ছিল আমলের প্রাণ, আর রিয়া অন্তরের সবচেয়ে ভয়ংকর রোগ। তাঁরা আমলের পরিমাণ বৃদ্ধির চেয়ে নিয়তের পরিশুদ্ধিতার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। এজন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) সহ বহু মুহাদ্দিছ তাঁদের সংকলিত হাদীছ গ্রন্থসমূহের শুরুতে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'[২] হাদীছটি নিয়ে এসেছেন। আব্দুর রহমান বিন মাহদী (রহ.) বলেন, لَوْ صَنَّفْتُ كِتَابًا فِي الْأَبْوَابِ، لَجَعَلْتُ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فِي كُلِّ بَابٍ 'আমি যদি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত কোন গ্রন্থ রচনা করতাম, তবে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শুরুতেই ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বর্ণিত নিয়তের হাদীছটি উল্লেখ করতাম'।[৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًا، فَلْيَبْدَأْ بِحَدِيثِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'যে ব্যক্তি কোন গ্রন্থ রচনা করতে চায়, তার উচিত নিয়তের হাদীছটি দ্বারা গ্রন্থের সূচনা করা'। এজন্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বান এই হাদীছটিকে জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪] ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, يَدْخُلُ هٰذَا الْحَدِيثُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ 'এই হাদীছটি ফিক্বহের সত্তরটি অধ্যায়ে প্রযোজ্য'।[৫]

ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাছীর (রহঃ) বলেন, تَعَلَّمُوا النِّيَّةَ، فَإِنَّهَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَمَلِ 'নিয়ত শিক্ষা কর। কারণ বিশুদ্ধ নিয়ত আমলের চেয়েও অধিক ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যপূর্ণ'।[৬] ইবনু আবী জামরাহ বলেন, 'আমার প্রবল ইচ্ছা, যদি ফকীহদের মধ্যে এমন কেউ থাকতেন, যার একমাত্র কাজ হতো মানুষকে আমলের উদ্দেশ্যে (নিয়ত ও আন্তরিকতা) শিক্ষা দেওয়া। তিনি শুধু নিয়তের হাদীছটিই পাঠদান করতেন।[৭] কারণ, মানুষের অধিকাংশ বিপর্যয় ও বিচ্যুতি ঘটেছে এই বিষয়টির প্রতি অবহেলার কারণেই। যুবাইদ ইবনুল হারেছ আল-ইয়ামী (রহ.) বলেন, 'আমি আনন্দিত হই- যেন আমরা প্রতিটি কাজেই একটি নেক নিয়ত থাকে; এমনকি খাওয়া ও ঘুমানোর ক্ষেত্রেও'।[৮] আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইদ (রহ.) বলেন, 'আমার পিতা বলতেন, 'হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি যে কাজই করতে চাও না কেন, তাতে কল্যাণের নিয়ত কর; এমনকি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়ার সময়ও'।[৯]

নিয়তের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে সালাফে ছালেহীন প্রতিনিয়ত তাদের নিয়তকে নবায়ন করতেন। সুফয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي؛ لِإِنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ 'নিজের নিয়তকে বিশুদ্ধ ও স্থির রাখার মতো সংগ্রাম আর কোন কিছুর সঙ্গে আমাকে করতে হয়নি। কারণ, আমার নিয়ত বারবার রূপ বদলায়'।[১০]

ইউসুফ বিন আসবাত (রহঃ) বলেন, تَخْلِيصُ النِّيَّةِ مِنْ فَسَادِهَا أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الِاجْتِهَادِ 'দীর্ঘ সময় ব্যাপী ইবাদত-বন্দেগী করার চেয়েও আমলকারীদের জন্য বেশী কঠিন হল নিজের নিয়তকে সকল প্রকার রিয়া, খ্যাতির লোভ ও নফসের কলুষতা থেকে পবিত্র রাখা'।[১১]

একদিন হাসান বাছরী (রহঃ) নছীহত করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল। হাসান বাছরী বললেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এই কান্নার মাধ্যমে তুমি কী উদ্দেশ্য করেছিলে'?[১২] অর্থাৎ তোমার কান্না কি সত্যিকার আল্লাহভীতি ও আন্তরিকতার কারণে ছিল, নাকি লোক দেখানোর জন্য।

নিয়তগুণে অনেক ছোট আমলও বড় আমলে পরিণত হয়। আবার নিয়তে ইখলাছ না থাকার কারণে অনেক বড় আমলও ছোট ও ক্ষুদ্র আমলে পরিণত হয়। তাই ইবাদত কবুলের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা অত্যন্ত যরূরী। ইবনু আজলান (রহঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ لَا يَصْلُحُ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِنَّ: التَّقْوَى، وَالنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ

১. তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ. ৪৬১।
২. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।
৩. ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৬১।
৪. বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান, ১/২৬৩; আস-সুনানুছ ছুগরা ১/৮।
৫. খতীব বাগদাদী, আল-জামে লিআখলাকির রাবী ২/২৯০।
৬. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/৭০।
৭. ইবনুল হাজ্জ, আল-মাদখাল, ১/৬।
৮. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ৬৪।
৯. ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী, আল-মুজালাসাহ, পৃ. ৮/২৬৬।
১০. আল-জামে লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে, ১/৩১৭।
১১. আল-মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৫/২৬৮।
১২. ইবনু আবিদ দুনয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ২৫।

وَالْإِصَابَةُ ‘তিনটি গুণ ছাড়া কোনো আমল বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয় না। ১. আল্লাহভীতি ২. বিশুদ্ধ নিয়ত ও ৩. সঠিক পদ্ধতি (সুন্নাহ অনুযায়ী আমল সম্পাদন)’।[১৩]

ইমাম মাওয়ার্দী (৯৭৫-১০৫৮খ্রি.) তাফসীর, ফিক্বহ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ লিখেছেন। তার ‘আল-আহকামুস সুলতানিইয়াহ’ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অসাধারণ গ্রন্থ। ‘আল-হাবী আল-কাবীর’ শাফেঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্বহ গ্রন্থ। অথচ তিনি জীবদ্দশায় তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো প্রকাশ করেননি। সবগুলো বই নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, তিনি ছাড়া যা কেউ জানত না। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বললেন, অমুক স্থানে যে বইগুলো রয়েছে, সেগুলো সবই আমার রচনা। আমি এগুলো প্রকাশ করিনি। কারণ আমার নিয়ত সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটি হয়েছে বলে নিশ্চিত হতে পারিনি। যখন তুমি আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় দেখতে পাবে, তখন আমার হাতে হাত রাখবে। যদি আমি তোমার হাত শক্ত করে চেপে ধরি, তাহলে বুঝবে আমার এসব রচনার কোনটিই আল্লাহ কবুল করেননি। অতএব তুমি বইগুলো নিয়ে রাতের অন্ধকারে দজলা নদীতে ফেলে দিবে। আর আমি যদি আমার হাত প্রসারিত করে দেই এবং তোমার হাত চেপে না ধরি, তাহলে বুঝবে আল্লাহ এগুলো কবুল করেছেন। আমি খালেছ নিয়তের যে কামনা করতাম তা অর্জন করেছি। ঐ ব্যক্তি বলেন, অতঃপর যখন তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হল, আমি আমার হাত তার হাতে রাখলাম। তিনি তার হাত প্রসারিত করে দিলেন। আমার হাত চেপে ধরলেন না। তখন আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ তার রচনাগুলো কবুল করেছেন। ফলে তার মৃত্যুর পর তার গ্রন্থগুলো আমি প্রকাশ করলাম’।[১৪]

ইবনু আকীল (রহঃ) বলেন, আমি আমাদের শায়খ আবু ইসহাক আশ-শীরাযীকে দেখেছি, তিনি কোন দরিদ্রকে কিছু দান করার আগে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের নিয়তকে খালেছ করে নিতেন। কোন মাসআলা নিয়ে কথা বলার আগে তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং সত্যের সমর্থনে একনিষ্ঠ ও খাঁটি নিয়তের মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ করতেন; মানুষের প্রশংসা বা বাহবা অর্জনের জন্য নয়। আর কোন গ্রন্থ রচনার আগে কয়েক রাক‘আত ছালাত আদায় করে নিতেন। তাই এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে, তাঁর নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়ে গেল এবং তার রচনাবলী পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এসবই ইখলাছ বা নিয়তের বিশুদ্ধতার বরকত’।[১৫]

কাযী ইবনুল লাহহাম বলেন, একবার আমাদের শায়খ ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) আমাদের সামনে একটি মাসআলা আলোচনা করলেন। তিনি বিষয়টি এত বিস্তৃতভাবে এবং নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন যে, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। এরপর একদিন সেই একই মাসআলা বিভিন্ন মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক সভায় উপস্থাপিত হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি সেখানে এ বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। সভা শেষে আমি তাকে বললাম, ‘আপনি তো এ বিষয়ে আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। আজ কিছুই বললেন না কেন’? তখন তিনি উত্তরে বললেন, ‘আমি কেবল সেই কথাই বলি, যার ছওয়াব পাওয়ার আশা রাখি। কিন্তু এই সভায় কথা বলতে আমার ভয় হয়েছে’।[১৬]

এই ঘটনা সালাফদের নিয়তের বিশুদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা ইলম যাহির, বিতর্কে জয়লাভ বা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে কথা বলতেন না; বরং তখনই কথা বলতেন, যখন তা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হত এবং তাঁরা এর ছওয়াবের আশা করতেন। নীরবতাকে তারা অনেক সময় কথার চেয়েও উত্তম মনে করতেন, যদি কথা বলায় রিয়া, আত্মপ্রদর্শন বা ফিতনার আশংকা থাকত।

আধুনিক মুফাস্সির মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (রহঃ) বাল্যকালে আরবদের নসবনামা সম্পর্কে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তা মাটিতে পুঁতে ফেলেন। কারণ সমবয়সীদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করার জন্য তিনি সেই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। তার শিক্ষকরা তাকে এব্যাপারে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, তুমি তোমার নিয়তকে পরিবর্তন করে নিতে পারতে।[১৭] কিন্তু শানকীতীর এই খাঁটি নিয়তের দরুন পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর দরস ও রচনায় দারুণ বরকত দান করেছিলেন। তাঁর তাফসীর ‘আযওয়াউল বায়ান’ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

২. আমল কবুল হওয়ার ভয় :

সালাফে ছালেহীন নিজেদের আমল নিয়ে কখনো গর্ব-অহংকার করতেন না। বরং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের আমল কবুল হয়েছে কি-না সেই চিন্তায় বিভোর থাকতেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ‘এবং তাদেরকে যা (রিযিক) দেওয়া হয়েছে তা থেকে যারা (আল্লাহ্‌র পথে) দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে’ *(মুমিনূন ২৩/৬০)*।

আয়েশা (রাঃ) এই আয়াতটি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন, أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ

১৩. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৭১।
১৪. যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১৮/৬৬; ইবনু খাল্লিকান, অফায়াতুল আ‘য়ান, ৩/২৮২।
১৫. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/২৭৪; ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদাইউল ফাওয়ায়েদ, ৩/১৭৫।
১৬. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৩৭।
১৭. রাশেদ বিন ওছমান বিন আহমাদ আয-যাহরানী, ইতহাফুন নুবালা বিসিয়ারিল উলামা (রিয়াদ : দারুছ ছুমায়ঈ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ‘তবে তারা কি সেই সকল লোক, যারা মদ পান করে এবং চুরি করে’? তিনি বললেন, ‘না, হে ছিদ্দীকের কন্যা! বরং তারা হল এমন লোক, যারা ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ছাদাক্বা করে; তবুও তারা ভয় করে যে, তাদের আমল হয়তো কবুল হবে না। তারাই কল্যাণকর কাজগুলো সম্পাদনে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তারাই এসব সৎকর্মে অগ্রগামী’।[১৮]

ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্র ঘর কা‘বা নির্মাণের মতো মহৎ কাজ করার পরেও আত্মতুষ্টিতে ভোগেননি। বরং বিনীত কণ্ঠে বলেছিলেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*।

সালাফদের অন্তরে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্র সাহায্য বা তাওফীক ছাড়া কোনো আমলই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ‘আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত’ *(হূদ ১১/৮৮)*।

সালাফে ছালেহীন সবসময় ভয় ও আশা নিয়ে চলতেন। আবু আলী আর-রুযবারী বলেন, ‘ভয় ও আশা হলো পাখির দু’টি ডানার মতো। যখন উভয়টিই সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, তখন পাখি সোজা ও পরিপূর্ণভাবে উড়তে পারে। আর যখন কোনো একটি ডানা দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার উড্ডয়নে ত্রুটি দেখা দেয়। আর যখন উভয় ডানাই নষ্ট হয়ে যায়, তখন পাখিটি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়’।[১৯] এজন্যই বলা হয়, ‘যদি কোনো মুমিনের ভয় ও আশা ওযন করা হয়, তাহলে উভয়টির ওযন সমান হবে’।[২০]

একটি সামান্য আমলও যদি আল্লাহ কবুল করেন, তারা সেটিকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়েও মূল্যবান মনে করতেন। তারা সৎকর্ম সম্পাদন করতেন, আবার সেই আমল কবুল না হওয়ার ভয়ও করতেন। মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, الْخَوْفُ عَلَى الْعَمَلِ أَلَّا يُتَقَبَّلَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ ‘আমল করার চেয়ে আমল কবুল হবে কি-না এই আশংকা ও ভয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ’।[২১]

আবুল লায়েছ সামারকান্দী বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে তার চারটি বিষয়ে ভয় থাকা প্রয়োজন। **প্রথমত:** আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে ভয়। কারণ, আল্লাহ বলেছেন ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকেই (আমল) কবুল করেন’ *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। **দ্বিতীয়ত:** রিয়ার ব্যাপারে ভয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে...’ *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। **তৃতীয়ত:** আমল আল্লাহ্র কাছে পৌঁছানো ও সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে ভয়। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে (নিয়ে আসবে), সে তার দশগুণ নেকী পাবে’ *(আন‘আম ৬/১৬০)*। এখানে নেক আমল নিয়ে আসাকে শর্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমলটি সম্পাদন করার পর তা আখিরাত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াও যরূরী। **চতুর্থত:** আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র তৌফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়। কারণ কেউ জানেনা আগামীতে সে সৎ কাজ করার তৌফিক পাবে কিনা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই’ *(হূদ ১১/৮৮)*।[২২]

আব্দুল আযীয বিন আবু রাওয়াদ বলেন, ‘আমি সালাফে ছালেহীনকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, তারা নেক আমল করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। অতঃপর যখন তারা কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতেন, তখন তাদের মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ ভর করতো- তাদের আমল কবুল হবে কি-না’?[২৩]

সালাফে ছালেহীন আল্লাহ্র কবুলিয়াতকে নিজের সাফল্যের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি বলে মনে করতেন। আলী (রাঃ) বলেন, كُونُوا لِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ هَمًّا مِنْكُمْ بِالْعَمَلِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ‘তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক চিন্তান্বিত হও। তোমরা কি আল্লাহ্র এই বাণী শোননি, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের পক্ষ থেকেই (আমল) কবুল করে থাকেন’ *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।[২৪]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, ‘আমি যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ আমার দু’রাক‘আত ছালাত কবুল করেছেন, তাহলে আমি বলতাম নিশ্চয়ই আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত’। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র এই বাণীটি তিলাওয়াত করলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের পক্ষ থেকেই (আমল) কবুল করে থাকেন’ *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।[২৫]

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, ‘আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আল্লাহ আমার একটি মাত্র ছালাত কবুল করেছেন, তাহলে তা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও অধিক প্রিয়’। কেননা আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের পক্ষ থেকেই (আমল) কবুল করে থাকেন’ *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।[২৬]

ফাযালাহ বিন ওবায়েদ বলেন, لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ‘আমি যদি

১৮. তিরমিযী হা/৩১৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৮, হাদীছ ছহীহ।
১৯. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আ‘মালুল কুলূব, পৃ. ২২০।
২০. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ৩০৬।
২১. ইবনু রজব, লাতাইফুল মা‘আরিফ (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৮৫।
২২. তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ৩৯৩।
২৩. লাতাইফুল মা‘আরিফ পৃ. ২৮৫।
২৪. আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ১৫; লাতাইফুল মা‘আরিফ, পৃ. ২৮৫।
২৫. আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ১৩, টীকা-২।
২৬. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/১০৪, মায়েদাহ ২৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

জানতে পারি যে, আল্লাহ আমার একটি সরিষার দানা পরিমাণ আমলও কবুল করেছেন, তাহলে তা আমার কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে- সবকিছুর চেয়েও অধিক প্রিয়। কারণ আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের পক্ষ থেকেই (আমল) কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।[২৭]

আমের বিন আব্দুল্লাহ আল-আম্বরী মৃত্যুর সময় কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'আপনি কাঁদছেন কেন'? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াতের কারণে'। জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন আয়াত? তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের পক্ষ থেকেই আমল কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।[২৮]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন সৎকর্ম ও ভয়ের সমন্বয় ঘটায়; আর মুনাফিক পাপাচার ও নিরাপদবোধ উভয়কে একত্র করে'।[২৯] অর্থাৎ মুমিন যত বেশি নেক আমল করে, তত বেশি আল্লাহ্র কাছে তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে ভীত-বিনয়ী থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিক পাপ ও ত্রুটিতে লিপ্ত থেকেও নিজেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করে।

মোটকথা, সালাফে ছালেহীন বেশী আমল করেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতেন না। তাদের ভয় ছিল- আমলের মধ্যে রিয়া, অহংকার বা অন্য কোন ত্রুটি নিজেদের অজান্তেই ঢুকে গেছে কি-না এবং আল্লাহ তা কবুল করবেন কি-না। মু'আল্লা ইবনুল ফযল বলেন, 'তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ছয় মাস ধরে দো'আ করতেন-যেন তিনি তাদেরকে রামাযান মাসের নাগাল পাইয়ে দেন। এরপর আরো ছয় মাস দো'আ করতেন, যেন তিনি তাদের রামাযান মাসে কৃত আমলগুলো কবুল করে নেন'।[৩০]

৩. গোপন আমলের মাধ্যমে ইখলাছের প্রশিক্ষণ গ্রহণ :

সালাফে ছালেহীন তাদের আমলকে যথাসম্ভব গোপন রাখতেন। কারণ তারা রিয়াকে সৎ আমলের নীরব ঘাতক মনে করতেন। তাদের কাছে আমল ছিল আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার একান্ত সম্পর্ক, মানুষের প্রশংসা পাওয়ার বিষয় না। বিশেষ করে নফল ছালাত, তাহাজ্জুদ, দান-ছাদাক্বাহ, ছিয়াম, কান্না ও দো'আর মতো আমল তারা যথাসম্ভব মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখতেন।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে ফেলতেন, অথচ মানুষ তা জানতে পারত না। এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যিনি প্রচুর ফিক্বহের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, কিন্তু মানুষ তার জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিল না। আবার এমন ব্যক্তিও ছিলেন যিনি নিজের ঘরে দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতেন, অথচ তার বাড়ীতে অবস্থানরত মেহমান পর্যন্ত তা টের পেত না'। তিনি বলেন, 'আমরা এমন কিছু মানুষকে পেয়েছি, যারা পৃথিবীতে গোপনে যে নেক আমল করতে সক্ষম ছিলেন, তা কখনোই প্রকাশ্যে করতেন না'। তিনি আরো বলেন, 'মুসলমানরা দো'আ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতেন; কিন্তু তাদের কোন আওয়ায শোনা যেত না। তাদের দো'আ ছিল কেবল নিজেদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যকার মৃদু ফিসফিসানি। এর কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। আল্লাহ এক নেক বান্দার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার এই গোপন আমলকে পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا 'যখন সে [যাকারিয়া (আঃ)] তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল চুপে চুপে' *(মারইয়াম ১৯/৩)*।[৩১]

ছাহাবায়ে কেরাম তাঁদের আমলকে রিয়া ও লোকদেখানো প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে কেমন সচেতন ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত হল নিম্নোক্ত ঘটনাটি-

মাদায়েন বিজয়ের পর যখন গণীমতের সম্পদ একত্রিত করা হল, তখন এক ব্যক্তি একটি মূল্যবান পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়ে তা গণীমতের মাল গ্রহণকারীর কাছে বুঝিয়ে দিলেন। সবাই তা দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, এরকম মহামূল্যবান সম্পদ তো আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের কাছে যা কিছু আছে, তার মূল্যও এর সমান নয়, এমনকি এর কাছাকাছিও নয়। তারা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, এর থেকে কিছু কি তুমি নিজের জন্য নিয়েছ? লোকটি বলল, যদি আল্লাহ্র ভয় না থাকত তাহলে আমি কস্মিনকালেও এ সম্পদ নিয়ে তোমাদের কাছে আসতাম না। উপস্থিত লোকরা বুঝতে পারল, এই লোকটি ভিন্ন চরিত্রের। তারা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে আমার পরিচয় বলব না- যাতে তোমরা আমার প্রশংসা করো। আর অন্যদের কাছেও আমার পরিচয় প্রকাশ করব না- যাতে তারা আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। বরং আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি এবং তাঁর পুরস্কারেই সন্তুষ্ট থাকি'। অতঃপর লোকেরা তার পরিচয় জানার জন্য একজন ব্যক্তিকে তার পিছু নিতে বলল। সেই ব্যক্তি তার অনুসরণ করতে করতে অবশেষে তার সাথীদের কাছে পৌঁছে গেল। সেখানে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, তিনি ছিলেন আমির ইবনু আবদে কায়েস (রাঃ)।[৩২]

এই ঘটনাটি সালাফে ছালেহীনের ইখলাছ ও আমল গোপন রাখার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতো মূল্যবান সম্পদ আল্লাহ্র পথে সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দেওয়ার পরও তিনি চাননি মানুষ তার নাম জানুক বা তাঁর প্রশংসা করুক। তাঁর কাছে মানুষের প্রশংসার চেয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও পুরস্কারই ছিল যথেষ্ট। তাঁর কথাটি যেন ইখলাছের একটি জীবন্ত সংজ্ঞা 'বরং আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি এবং তার পুরস্কারেই সন্তুষ্ট থাকি'।

---

২৭. আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ২০; লাতাইফুল মা'আরিফ, পৃ. ২৮৫।
২৮. তাফসীরে তাবারী, ১০/২১২; আদ-দুররুল মানছূর, ৩/৫৭।
২৯. তাফসীরে তাবারী, ১৯/৪৫।
৩০. লাতাইফুল মা'আরিফ, পৃ. ২০৪, ২৮৫।
৩১. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৪৭১; আ'রাফ ৫৫ আয়াতের তাফসীর দ্র.।
৩২. তারীখে তাবারী, ৪/১৯।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, خَيْرُ الْعَمَلِ أَخْفَاهُ، أَمْنَعُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَبْعَدُهُ مِنَ الرِّيَاءِ ‘সর্বোত্তম আমল হলো গোপন আমল। তা শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে অধিক সুরক্ষিত এবং রিয়া থেকে অধিক দূরে’।[৩৩] এজন্য সালাফে ছালেহীন তাদের ক্রন্দন ও আল্লাহভীতিকে পর্যন্ত গোপন রাখতেন। যাতে রিয়ার বিষাক্ত ছোবলে তা কলুষিত না হয়। আছেম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ওয়াইল (রহঃ) যখন নির্জনে থাকতেন, তখন কাঁদতেন। একবার তাকে আমি সিজদায় বলতে শুনলাম, তিনি বলছেন, ‘হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি দয়া কর! হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা কর! হে আমার রব! তুমি যদি আমাকে ক্ষমা কর, তবে তোমার পক্ষ থেকে অফুরন্ত অনুগ্রহেই আমাকে ক্ষমা করবে। আর যদি আমাকে শাস্তি দাও, তবে কোন যুলুম না করেই শাস্তি দেবে। আর তোমার শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পূর্ব-অধিকারও আমার নেই’। এরপর তিনি এমনভাবে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন, যেন শোকাহত কোনো মা তার সন্তান হারিয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে। আছেম (রহঃ) বলেন, وَلَوْ جُعِلَتْ لَهُ الدُّنْيَا عَلَى أَنْ يَبْكِيَ وَأَحَدٌ يَرَاهُ، لَمْ يَفْعَلْ ‘তাঁকে যদি সমগ্র পৃথিবীর সম্পদও দেওয়া হতো, শুধু এই শর্তে যে- কেউ তাকে কাঁদতে দেখবে, তবুও তিনি তা গ্রহণ করতেন না’।[৩৪]

এক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর পাশে কাঁদছিল। তখন তিনি তাকে বললেন, আগের যুগে কোনো ব্যক্তি তার সঙ্গীর পাশে কাঁদত, অথচ তাঁর সঙ্গীও জানতে পারত না যে, সে কাঁদছে।[৩৫]

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি‘ (রহঃ) বলেন, ‘আমি এমন কিছু মানুষকে পেয়েছি, যাদের যুগে স্বামী-স্ত্রী একই বালিশে মাথা রেখে ঘুমাতেন; অথচ তার গাল বেয়ে এত অশ্রু ঝরত যে, বালিশের নিচের অংশ অশ্রুতে ভিজে যেত-কিন্তু তার স্ত্রী বিন্দুমাত্র টের পেত না। তিনি বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি এমন লোকদের পেয়েছি, তাদের কেউ ছালাতের কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকতেন; তাঁর অশ্রু গড়িয়ে গালে পড়ত, অথচ তাঁর পাশের মুছল্লীটিও তা টের পেত না’।[৩৬] মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি‘ আরো বলেন, ‘কোন ব্যক্তি এমনও ছিলেন যিনি বিশ বছর ধরে কাঁদতেন, অথচ তার জীবনসঙ্গীনী স্ত্রী পর্যন্ত তার কান্নার বিষয়টি টের পেত না’।[৩৭]

মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ বলেন, আমি আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি মসজিদে এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে সিজদারত অবস্থায় কাঁদছিল এবং দো‘আ করছিল। তখন তিনি তাকে বললেন, أَنْتَ أَنْتَ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي بَيْتِكَ ‘তুমি তো তুমি-ই (অর্থাৎ তোমার এই কান্নার মধ্যে লোক দেখানোর আশংকা রয়েছে)। যদি তুমি এভাবে তোমার ঘরের ভেতরে নিভৃতে কাঁদতে, তাহলে কতই না ভালো হত’![৩৮]

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, وَلِخَوْفِ الرِّيَاءِ سَتَرَ الصَّالِحُونَ أَعْمَالَهُمْ حَذَرًا عَلَيْهَا، وَبَهْرَجُوهَا بِضِدِّهَا ‘রিয়ার আশংকায় সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাদের আমল গোপন করতেন। আমলকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য কখনো তার বিপরীত আচরণও তারা প্রকাশ করতেন’। ইবনু সীরীন দিনে হাসতেন, রাতে কাঁদতেন। ইবরাহীম ইবনু আদহাম অসুস্থ হলে তার কাছে এমন খাবার রেখে দেওয়া হতো যা সুস্থ ব্যক্তিরা খেতেন।[৩৯]

আইয়ুব আস-সাখতিয়ানীর যুগে নিজেকে ইবাদতগুযার ও পরহেযগার হিসাবে যাহির করার জন্য অনেকে জামা গুটিয়ে পরতেন। তাই তিনি লোকদেখানো ধার্মিকতার আশংকায় জামা গুটিয়ে না নিয়ে কিছুটা লম্বা রাখতেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, الشُّهْرَةُ الْيَوْمَ فِي التَّشْمِيرِ ‘আজকাল খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জনের নিদর্শন হল জামা গুটিয়ে পরা’।[৪০] তিনি এক মজলিসে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে অশ্রু এসে গেল। তখন তিনি নাক ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, مَا أَشَدَّ الزُّكَامَ ‘সর্দি কতই না তীব্র’![৪১] আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী সারারাত তাহাজ্জুদ ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তা গোপন রাখতেন। ভোর হলে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর এমনভাবে উঁচু করতেন, যেন তিনি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে ছালাত শুরু করেছেন।[৪২] যাতে মানুষ তার রাত জাগা ও ইবাদত সম্পর্কে জানতে না পারে।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, আবুস সালীল যখন কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন অথবা কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর কান্না এসে যেত। কিন্তু তিনি সেই কান্নাকে হাসিতে পরিণত করে দিতেন, যাতে তাঁর কান্না প্রকাশ না পায়।[৪৩]

আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা (রহঃ) ছালাত আদায় করতেন। কেউ তার কাছে প্রবেশ করলে তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তেন।[৪৪]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) তুরসুস নগরীতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। তিনি রাক্কা শহরে একটি মুসাফিরখানায় অবস্থান করতেন। সেখানে এক যুবক নিয়মিত তাঁর কাছে আসত, তাঁর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করে দিত এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনত। একবার তিনি রাক্কায় এসে দেখলেন,

৩৩. আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ২৫।
৩৪. ঐ, পৃ. ২৬; তালবীসু ইবলীস, পৃ. ১২৮।
৩৫. আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ২৭।
৩৬. ঐ, পৃ. ২৮।
৩৭. ঐ, পৃ. ৩১; ইবনু আবিদ দুনয়া, আর-রিক্কাতু ওয়াল বুকা, পৃ. ১৩৬।
৩৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/৩৬১; তালবীসু ইবলীস, পৃ. ২৫৯।
৩৯. তালবীসু ইবলীস, পৃ. ১৩৮।
৪০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/২২।
৪১. ঐ, ৬/২০।
৪২. ঐ, ৬/১৭; তাহযীবুল কামাল, ১/৪৩৪।
৪৩. আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ২৯।
৪৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/২৬৪; আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৯৪।

সেই যুবকটি নেই। ইবনুল মুবারক (রহঃ) শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। অভিযান শেষে ফিরে এসে তিনি যুবকটির খোঁজ নিলেন। তাঁকে বলা হল, সে দশ হাযার দিরহাম ঋণের কারণে কারাগারে বন্দী রয়েছে। তখন ইবনুল মুবারক সেই ঋণদাতার সন্ধান করে দশ হাযার দিরহাম পরিশোধ করে দিলেন এবং তাকে শপথ করিয়ে বললেন, ‘আমি যতদিন জীবিত থাকি, এ কথা তুমি কাউকে জানাবে না’। এরপর যুবকটিকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। ইবনুল মুবারক সেখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন। রাক্কা থেকে দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পর সেই যুবক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ইবনুল মুবারক তাকে বললেন, হে যুবক! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমি তো তোমাকে দেখতে পাইনি। যুবক বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি ঋণের কারণে কারাগারে বন্দী ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে মুক্ত হলে? যুবক বলল, একজন লোক এসে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন; কিন্তু আমি তার পরিচয় জানি না। ইবনুল মুবারক বললেন, তাহলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করো। সেই যুবক ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর পরেই জানতে পেরেছিল যে, তিনিই গোপনে তার ঋণ পরিশোধ করে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলেন।[৪৫]

বিখ্যাত তাবেঈ দাউদ ইবনে আবী হিন্দ (রহঃ) একটানা ৪০ বছর নফল ছিয়াম রেখেছেন, কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরাও তা জানতে পারেনি। তিনি পেশায় ছিলেন একজন মুচি। সকালে স্ত্রীর কাছ থেকে দুপুরের খাবার নিয়ে দোকানে যেতেন এবং রাস্তায় তা গরীবদের দান করে দিতেন। ফলে স্ত্রী ভাবতেন তিনি দোকানে খেয়েছেন, আর বাজারের লোকেরা ভাবত তিনি বাড়ীতে খেয়ে এসেছেন।[৪৬]

সালাফগণ বিশ্বাস করতেন, ইবাদতের মিষ্টতা মানুষের দৃষ্টির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত বুযুর্গ বিশর আল-হাফী (রহঃ) বলতেন, لَا تَجِدُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ حَتَّى تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ سَدًّا ‘তুমি ইবাদতের আসল স্বাদ বা মিষ্টতা ততক্ষণ পর্যন্ত পাবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার এবং মানুষের দৃষ্টির মাঝে একটি দেয়াল (আড়াল) তৈরি করবে’। রাবী‘ ইবনে খুছাইম যখন ঘরে নিভৃতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন হঠাৎ কেউ ঘরে প্রবেশ করলে তিনি নিজের কাপড় দিয়ে মুছহাফ ঢেকে দিতেন।[৪৭]

আ‘মাশ বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈর কাছে ছিলাম। তখন তিনি মুছহাফ দেখে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় একজন লোক তার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি মুছহাফটি ঢেকে রাখলেন এবং বললেন, ‘সে যেন এমনটি মনে না করে যে, আমি প্রতি মুহূর্তেই কুরআন পড়ি’।[৪৮]

মুহাম্মাদ বিন আসলাম আত-তূসী একটি ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং সঙ্গে একটি পানির পাত্র নিয়ে যেতেন। তিনি ভেতরে কী করতেন, তা আমি জানতাম না। একদিন তাঁর ছোট একটি ছেলেকে তাঁর কান্নার কথা বলতে শুনলাম। তার মা তাকে নিষেধ করলেন। আমি তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই কান্নার ব্যাপারটি কী’? তিনি বললেন, আবুল হাসান এই ঘরে প্রবেশ করেন, তারপর কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং কাঁদেন। ছেলেটি তাঁর কান্নার শব্দ শুনে সেটার অনুকরণ করে। তিনি যখন ঘর থেকে বের হতে চাইতেন, তখন মুখ ধুয়ে নিতেন এবং চোখে সুরমা লাগাতেন, ফলে তাঁর চেহারায় কান্নার কোনো চিহ্ন দেখা যেত না। তিনি কিছু লোকের প্রতি নিয়মিত সহায়তা ও অনুগ্রহ করতেন; তাদের অর্থ দিতেন এবং পোশাকও দিতেন। তারপর তাদের কাছে কোনো লোক পাঠিয়ে তাকে বলতেন, ‘খেয়াল রেখো, তারা যেন জানতে না পারে কে তাদের কাছে এসব পাঠিয়েছে। আর কখনো তিনি নিজেই রাতে তাদের কাছে সাহায্য নিয়ে যেতেন। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখতেন। কখনো এমনও হতো যে, তাদের পোশাক পুরোনো হয়ে যেত এবং ঘরে থাকা সামগ্রীও শেষ হয়ে যেত; তখন তিনি গোপনে আবার তাদের সাহায্য করতেন।[৪৯]

সালাফে ছালেহীনের জীবন পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, তাঁরা রিয়াকে শুধু একটি গুনাহ হিসাবে দেখতেন না; বরং এটিকে আমল ধ্বংসকারী এক মারাত্মক হৃদব্যাধি হিসাবে বিবেচনা করতেন। তাই তাঁরা আমলের আগে নিয়ত সংশোধন করতেন, আমলের মধ্যে অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং আমলের পরও কবুলিয়াতের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। মানুষের প্রশংসা তাঁদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না; বরং মানুষের অগোচরে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের কাছে অধিক প্রিয়। তাঁদের জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি, ইখলাছ মানে মানুষের দৃষ্টি থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়; বরং মানুষের দৃষ্টি ও প্রশংসার ঊর্ধ্বে উঠে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানানো। নেক আমল গোপন রাখা, নিজের প্রশংসা অপছন্দ করা, প্রশংসা শুনলে আত্মতুষ্ট না হওয়া, নিয়ত বারবার যাচাই করা এবং আল্লাহ্র কাছে ইখলাছের জন্য দো‘আ করা এসবই তাঁদের কাছে রিয়া থেকে বাঁচার উপায় ছিল।

বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তারের ফলে নেক আমলও কখনো কখনো প্রদর্শনের উপকরণে পরিণত হতে পারে। ফলে সালাফে ছালেহীনের ইখলাছ ও আত্মসচেতনতা আমাদের জন্য আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেকে প্রশ্ন করা, ‘আমি এই আমলটি কার জন্য করছি। আল্লাহ্র জন্য, না-কি মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য’? কারণ মানুষের প্রশংসা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই মুমিনের প্রকৃত অর্জন। তাই আমাদের জীবনের প্রতিটি নেক আমলের ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের মতোই নিজেদের অন্তরকে পাহারা দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!!

৪৫. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৩২/৪৫৫; খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১০/১৫৮; সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৮/৩৮৭।
৪৬. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৬/৩৭৮।
৪৭. ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৩৫; তালবীসু ইবলীস, পৃ. ৩৭৪; আল-মুন্তাযাম, ৬/৯।
৪৮. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ, পৃ. ২৯৫; ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/২৪৯।
৪৯. ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৩১৭; হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/২৪৩।

ডারউইনবাদ : বিজ্ঞানের আড়ালে নাস্তিকতার রাজনীতি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

বিজ্ঞান যখন বস্তুগত জগতের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে, তখন তা মানব কল্যাণে ভূমিকা রাখে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের খোলসে কোন তত্ত্ব যে বিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে একটি রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক এজেন্ডায় পরিণত হ'তে পারে, তার একটি বাস্তব উদাহরণ হ'ল চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution), যা স্রেফ একটি বৈজ্ঞানিক অনুকল্প (Hypothesis) থেকে আধুনিক যুগে ধর্মবিরোধী নাস্তিকদের জন্য বস্তুবাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

আধুনিক ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের (Renaissance) পর থেকে ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞানকে সত্য অনুসন্ধানের একটি নিরপেক্ষ মাধ্যম হিসাবে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু ১৯ শতকে এসে বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতার আড়ালে 'পদ্ধতিগত বস্তুবাদ' (Methodological Naturalism)-কে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা শুরু হয়। ফলে ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন যখন তার On the Origin of Species গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখন তা কেবল একটি জৈববৈজ্ঞানিক তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তৎকালীন ইউরোপের ঈশ্বরবিমুখ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ডারউইনবাদকে লুফে নেয়। কারণ এটি তাদের ঈশ্বরহীন বিশ্বদৃষ্টির এক বৈজ্ঞানিক সনদ জোগাড়ের সুযোগ করে দিয়েছিল।

আমাদের সন্তানরা আজ স্কুলে পড়ছে 'মানুষ মূলত বানর বা এপ গোত্রীয় নরবানর থেকে বিবর্তিত হয়েছে'। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে 'জীবন এলোমেলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলাফল'। পাঠ্যবইয়ে লেখা আছে, 'ডারউইনের তত্ত্ব একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য'। কিন্তু একটি প্রশ্ন কেউ করে না, এই তত্ত্ব কেন কিভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে প্রচার পেল? যে তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো ডারউইন নিজেই স্বীকার করেছিলেন, যে তত্ত্বের মূল দাবীগুলো ১৬৫ বছরেও প্রমাণিত হয়নি[১], সেই তত্ত্ব কেন বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর পাঠ্যক্রমে পর্যন্ত ঢুকে গেল? উত্তরটা মোটেই বৈজ্ঞানিক নয়; বরং রাজনৈতিক এবং মতাদর্শিক। বক্ষমাণ প্রবন্ধে ডারউইনবাদের বাস্তবতা পর্যালোচনা করব এবং এর পিছনের রাজনৈতিক এজেন্ডার অনুসন্ধান করব ইনশাআল্লাহ। যাতে নতুন প্রজন্ম এই মতবাদের আক্বীদাগত আঘাত-পরাঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

প্রাককথন :

আমরা জানি যে, বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হ'ল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও পুনরুৎপাদনযোগ্যতা। অথচ ডারউইনবাদের মূল দাবী হ'ল 'অন্ধ প্রাকৃতিক নির্বাচন' ও 'হঠাৎ রূপান্তরের' মাধ্যমে কোটি কোটি প্রজাতির উদ্ভব, যা কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবুও ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সার্বজনীন সত্য হিসাবে সারাবিশ্বে প্রচার করা হয়েছে। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, ডারউইনবাদ বিজ্ঞানের তত্ত্ব নয় বরং নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদের একটি সুপরিকল্পিত মতাদর্শিক প্রকল্প।

আশ্চর্যের বিষয় যে, আধুনিক যুগে ২০১৪ সালে বিবর্তনবাদের সপক্ষে প্রকাশিত হয় জেরুযালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউভাল নাওয়াহ হারিরি (জন্ম ১৯৭৬)-এর লিখিত Sapiens: A Brief History of Humankind (স্যাপিয়েন্স: মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)। এই বইটিকে হারিরি পূর্ণভাবে ডারউইনবাদ প্রচারের মাধ্যম বানিয়েছেন এবং দ্বিধাহীনভাবে প্রচার করেছেন যে, মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতোই বিবর্তনের ফল। তার সৃষ্টির পিছনে কোন ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বা বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। ৭০ হাযার বছর আগেও মানুষ ছিল প্রাণীজগতের আর দশটা প্রাণীর মত সাধারণ একটি প্রাণীই (An Animal of No Significance)। বর্তমান মানুষের মানুষ হয়ে ওঠা, তার মন-মগজের বিকাশ ও সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুই এক জৈবিক বিবর্তনের ফসল। এতে সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ্‌র কোন হাত নেই। বরং মানুষই নিজের মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজনে আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নামের ধারণা সৃষ্টি করেছে *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

তার মতে, বর্তমান মানবজগতের বিকাশ হয়েছে তিনটি বিপ্লবের মাধ্যমে। ১. (Cognitive Revolution), যা প্রায় ৭০ হাযার বছর আগে মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে। এরপর বিকাশ ঘটে কৃষিভিত্তিক বিপ্লবের (Agricultural Revolution), যা প্রায় ১২ হাযার বছর আগে মানুষের ইতিহাসকে দেয় নতুন গতি। সবশেষে, মাত্র ৫০০ বছর আগে সূচনা হয় বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের (Scientific Revolution)। এভাবেই নাকি মানুষ একটি সাধারণ প্রাণী থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসাবে বিবর্তিত হয়েছে, যার নাম দেয়া হয়েছে Homo (মানুষ) Sapiens (জ্ঞানী)।[২]

এই বইটিকে সর্বোচ্চ একটি রূপকথার কল্পকাহিনী (Fairy story) হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারত। কিন্তু অত্যাশ্চর্যের বিষয় হ'ল বস্তুবাদী নাস্তিক্যবাদী দর্শন প্রচারক এই সাধারণ বইটি ২০১৪ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে অদ্যাবধি মোট ৫০ মিলিয়নেরও বেশী কপি বিক্রি হয়েছে এবং ৬৫টিরও বেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৩] আরো মজার বিষয় যে, সমকামী এই ইহুদী লেখক এই একটি বইয়ের মাধ্যমেই রাতারাতি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী জনবুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত হয়েছেন! তার এই বিশ্বজোড়া সাফল্যের মূল চাবিকাঠি কি এটাই যে, তিনি ডারউইনবাদকে এক রোমাঞ্চকর 'সেক্যুলার মহাকাব্য' আকারে সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন! আর এজন্যই বোধহয় তার বইটি প্রচারের জন্য পশ্চিমা নাস্তিক্যবাদী মিডিয়া ও গ্লোবালিস্ট এলিট বারাক ওবামা, বিল গেটস, মার্ক

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, বিবর্তনবাদ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ১ম প্রকাশ : ২০২০), পৃ. ৯।

২. ইউভাল নাওয়াহ হারিরি, সেপিয়েন্স মানুষের ইতিহাস, বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা : মোস্তাক আহমেদ (১ম প্রকাশ : ২০১৯), পৃ. ১৮-২২।

৩. https://en.wikipedia.org.

জাকারবার্গ প্রমুখ ব্যক্তিরা এত ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং মিডিয়াতে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমান যুগের নব্য-নাস্তিক্যবাদের অন্যতম প্রধান মুখ রিচার্ড ডকিন্স (জন্ম : ১৯৪১খৃ.), স্যাম হ্যারিস (জন্ম : ১৯৬৭) বইটিকে অত্যন্ত বৈপ্লবিক এবং মেধাভিত্তিক কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। ডকিন্সের মতে, এখানে রয়েছে মানবজাতির এক বিস্তৃত ও চিন্তার খোরাক জোগানো ইতিহাস... 'স্যাপিয়েন্স' আমাদের প্রজাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দেয় (Sapiens gives us a whole new perspective on our species)।[৪]

তারা যেন এই বইটিকে ধর্মহীন পৃথিবীর 'নতুন বাইবেল' হিসাবে ব্যবহার করছে, যাতে সাধারণ পাঠক কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই ডারউইনবাদকে মানব ইতিহাসের একমাত্র সত্য হিসাবে গিলে নেয়।

মূলত মার্কস যেমন তার সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তি হিসাবে ডারউইনবাদকে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি নাস্তিকরাও ডারউইনের মতবাদকে ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। ডকিন্সের ভাষায়, ডারউইন 'বৌদ্ধিকভাবে পরিতৃপ্ত নাস্তিক' হওয়াকে সম্ভব করেছেন (Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist)।[৫]

ডারউইন আসলে কী ভেবেছিলেন!

আজকের নব্য-নাস্তিকরা ডারউইনকে যেভাবে নিজেদের 'ধর্মহীনতার পোস্টার বয়' বানিয়েছেন, ডারউইন নিজে কি তেমন ছিলেন? তার নিজস্ব চিঠিপত্র ও আত্মজীবনী ঘাটলে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। বাস্তবে তিনি নিজে কোন উগ্র নাস্তিক ছিলেন না; বরং নিজের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও ঈশ্বর ভাবনা নিয়ে সারাজীবন গভীর দোলাচলে ভুগেছেন। তিনি নিজেকে কখনও 'নাস্তিক' বলেননি। তিনি প্রথম জীবনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন ধর্মতত্ত্ব নিয়ে, পাদ্রি হওয়ার উদ্দেশ্যে।[৬] পরবর্তীতে ধর্মবিশ্বাস থেকে দূরে সরলেও ১৮৭৯ সালে জন ফর্ডাইসকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্পষ্ট লেখেন, 'আমার মানসিকভাবে কখনো ঈশ্বরকে অস্বীকার করার মতো নাস্তিক্যবাদী প্রবণতা ছিল না... আমি মনে করি, আমার মানসিক অবস্থার সবচেয়ে সঠিক বর্ণনাকারী শব্দ হ'ল আমি একজন 'অজ্ঞেয়বাদী' (Agnostic)।[৭]

তিনি নিজের মতবাদ নিয়েও তিনি ভয়াবহ দ্বিধা ও সংশয়ে ছিলেন। প্রকৃতিতে মানুষের চোখের মতো অতি-জটিল অঙ্গ কেবল 'অন্ধ সুযোগে' তৈরি হওয়া সম্ভব কি-না, তা নিয়ে ডারউইন ১৮৬০ সালে তার বন্ধু অ্যাসা গ্রেকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন, 'আজও চোখের জটিলতার কথা চিন্তা করলে আমার শরীরে ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে যায় (gives me a cold shudder)'[৮]।

অনুরূপভাবে ১৮৮১ সালে উইলিয়াম গ্রাহামকে লেখা চিঠিতে ডারউইন নিজের তত্ত্বের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'আমার মনে সর্বদা এক ভয়াবহ সংশয় জাগে, যদি মানুষের মস্তিষ্ক পশুর মস্তিষ্ক থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে, তবে মানুষের মস্তিষ্কের অর্জিত কোন বিশ্বাস বা অনুভূতির আদৌ কি কোন নির্ভরযোগ্যতা আছে? কোন নিম্নমানের প্রাণীর মস্তিষ্কে যদি কোন চিন্তা আসে, তবে কি কেউ তা বিশ্বাস করবে?'।[৯]

অর্থাৎ ডারউইন নিজেই বুঝেছিলেন যদি মানুষের মন কেবলই সাধারণ পশুর মস্তিষ্কের বিবর্তিত রূপ হয়, তবে তার নিজের 'বিবর্তন' তত্ত্বটিও তো সেই পশুমস্তিষ্কেরই ফসল! তাহ'লে এর সত্যতার চূড়ান্ত ভিত্তি কী?

সর্বোপরি ডারউইন মূলত একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী (naturalist) ছিলেন। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল, প্রজাতির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা। 'প্রতিটি প্রজাতি আলাদাভাবে সৃষ্ট' এই ধারণার বিপরীতে একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া (Natural Selection) দেখানো। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতি 'কিভাবে' কাজ করে তা বোঝা। প্রকৃতি 'কেন' করে বা সবকিছুর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কি সেসব দার্শনিক বা ধর্মীয় প্রশ্ন তার গবেষণার বিষয় ছিল না।

তবে প্রকৃতিতে মানুষের যন্ত্রণা, কষ্ট এবং সম্পদের অপচয় দেখে তিনি 'দয়ালু ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' ধারণা সম্পর্কে সন্দেহগ্রস্ত হন। এর ধারাবাহিকতায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবজগতের একধরনের ব্যাখ্যা পেয়ে তিনি 'প্রতিটি প্রজাতি আলাদাভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি'- এই বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যান। সেই সাথে তাঁর কন্যা অ্যানির মৃত্যুও তার ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরও নাড়া দেয়। ফলে তার সংশয়ী মনের ধারণা জন্মে যে, চূড়ান্ত প্রশ্নগুলো (সৃষ্টির শুরু, উদ্দেশ্য ইত্যাদি) মানব যুক্তির সীমার বাইরে। অতএব এসবের অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়।[১০]

ডারউইনবাদের মূল কথা :

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ছিলেন একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। যিনি দক্ষিণ আমেরিকা ও গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর দু'টি প্রধান গ্রন্থ On the Origin of Species (১৮৫৯) এবং The Descent of Man (১৮৭১) পশ্চিমা সভ্যতাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে দেয়।[১১] অন দ্য অরিজিন অফ স্পেশিস নামে চার্লস ডারউইনের এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। তার এই

৪. Making Sense Podcast (Episode 68: The Future of Humanity - March 2017).
৫. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (New York: Norton, 1986).
৬. https://bn.wikipedia.org/
৭. Charles Darwin, Letter to John Fordyce, May 7, 1879. Darwin Correspondence Project, Letter no. 12041.
৮. Charles Darwin, Letter to Asa Gray, April 3, 1860. Darwin Correspondence Project, Letter no. 2743.
৯. Charles Darwin, Letter to William Graham, July 3, 1881. Darwin Correspondence Project, Letter no. 13230.
১০. https://bn.wikipedia.org/
১১. সেপিয়েন্স মানুষের ইতিহাস, পৃ. ১৮-২২।

গ্রন্থে তিনি বিবর্তনবাদকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, ‘এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে কোন প্রাণী ক্রমাগত অভিযোজনের ফলে আপন পরিবেশের জন্যে বিশেষায়িত হ’তে হ’তে এক সময় নতুন একটি প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়’। তার তত্ত্বের মূল কথা হ’ল, মানুষ বিশেষ কোন সৃষ্টি নয় বরং বানরের মত এক ধরনের প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বিবর্তিত একটি বুদ্ধিমান প্রাণী। তার মতবাদের মূল কথাগুলো নিম্নরূপ :

১. প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের জয়লাভ (Natural Selection & Survival of the Fittest) : ডারউইনবাদের প্রথম কথা হ’ল, পরিবেশের সাথে যে প্রাণী বেশী মানানসই, সে বেশী বংশবিস্তার করে। এই প্রক্রিয়ায় দুর্বল প্রজাতি বিলুপ্ত হয়, শক্তিশালী প্রজাতি টিকে থাকে।[১২] ডারউইনের মতে, প্রকৃতিতে সম্পদগুলো (খাদ্য, বাসস্থান) সীমিত, কিন্তু প্রাণীর সংখ্যা ও তার বংশবৃদ্ধির হার অনেক বেশী। ফলে টিকে থাকার জন্য প্রাণীদের মধ্যে একটি নীরব প্রতিযোগিতা বা অস্তিত্বের সংগ্রাম শুরু হয়। এ সকল জীবের মধ্যে যাদের ভেতর আকস্মিকভাবে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তৈরী হয় যা পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে, প্রকৃতি তাদেরকেই টিকিয়ে রাখে এবং বংশবৃদ্ধির সুযোগ দেয়। আর যারা খাপ খাওয়াতে পারে না, তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় একেই বলা হয় ‘যোগ্যতমের জয়লাভ’ (Survival of the Fittest)।[১৩]

২. সাধারণ পূর্বপুরুষ বা এক-পূর্বপুরুষবাদ (Common Descent) : পৃথিবীর সকল জীব একটিমাত্র সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। ডারউইনের দাবী হ’ল, পৃথিবীর কোটি কোটি প্রজাতি পৃথকভাবে বা স্বাধীনভাবে সৃষ্টি হয়নি। বরং একটিমাত্র আদি সরল এককোষীয় এককোষী জীব (Single Common Ancestor) থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছর ধরে আজকের সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে।[১৪] তিনি জীবজগৎকে একটি বিশালাকার ‘জীবন-বৃক্ষ’ (Tree of Life)-এর সাথে তুলনা করেন, যার মূল বা কাণ্ড একটিই, কিন্তু শাখা-প্রশাখা থেকে জিনের আবিষ্কার হয়নি। ডারউইন কেবল দেখেছিলেন যে, একই নতুন নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে।

৩. আকস্মিক বা অন্ধ প্রকরণ (Random Variation & Mutation) : ডারউইনবাদের অন্যতম ভিত্তিমূলক দাবী হ’ল, ডিএনএ বা জিনের এলোমেলো পরিবর্তন প্রাণীদের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। ডারউইনের যুগে ডিএনএ বা পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সূক্ষ্ম শারীরিক পার্থক্য বা বৈচিত্র্য থাকে, যাকে তিনি Random Variation (এলোমেলো প্রকরণ) বলতেন। পরবর্তীকালে নব্য-বিবর্তনবাদীরা (Neo-Darwinists) জিনতত্ত্বের (Genetics) আবিষ্কারের পর এটিকে ডারউইনবাদের সাথে যুক্ত করে নাম দেয় Random Mutation (আকস্মিক রূপান্তর)। তাদের দাবী, ডিএনএ অনুলিপি করার সময় ভুলবশত বা এলোমেলোভাবে ঘটা মিউটেশনই প্রাণীর মধ্যে নতুন নতুন শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরির মূল ইঞ্জিন।

৪. মানুষ বানরজাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত (Human Evolution from Ape-like Ancestors) : ডারউইনবাদের মূল অনুসিদ্ধান্ত হ’ল, মানুষ পৃথক কোন প্রজাতি নয়; বরং বানরজাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত। The Descent of Man-এ তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন মানুষ আফ্রিকান এপ-জাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তিত। ১৮৫৯ সালে On the Origin of Species প্রকাশের সময় ডারউইন মানুষের বিবর্তন নিয়ে সরাসরি খুব বেশী কথা বলেননি। কিন্তু ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিতর্কিত গ্রন্থ The Descent of Man-এ তিনি স্পষ্টভাবে দাবী করেন যে, মানুষ কোন বিশেষ সৃষ্টি নয়। মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও ওরাংওটাং এরা সবাই আফ্রিকান এক প্রাচীন বানরজাতীয় বিলুপ্ত প্রজাতি (Common Primate Ancestor) থেকে আলাদা আলাদা শাখায় বিবর্তিত হয়েছে। মানুষ উক্ত প্রাণীসমূহেরই সমগোত্রীয় একটি প্রাণী।

ডারউইনবাদের অসারতা :

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ডারউইনবাদের ভিত্তিমূলকে চুরমার করে দিয়েছে। যদিও ডারউইনের বই প্রকাশিত হওয়ার ১০ বছর পর যখন গ্রেগর মেণ্ডেল তার The Laws of Genetics (1866)-এ প্রজনন শাস্ত্র (Genetics) বা জীবনের বংশানুক্রমিকতা সম্পর্কিত গবেষণাটি প্রকাশ করেন তখনই ডারউইনের মতবাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। মেণ্ডেল প্রমাণ করেছিলেন যে, বংশানুক্রমিক বস্তুর বিশেষ একক (Unit) জিন যেমন নির্দিষ্ট, তেমনি তা মিশ্রণ অযোগ্য। অর্থাৎ এক প্রজাতির জিন অন্য প্রজাতির জিন-এ রূপান্তরিত বা সংক্রমিত হ’তে পারে না। তা বংশানুক্রমিক সংক্রমণে মূলতঃ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব কোষের কেন্দ্রবিন্দুতে বন্দী।[১৫] তবে ১৯৩০ হ’তে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত মেণ্ডেলের ‘জেনেটিক্সে’র সাথে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনে’র সিনথেসিস করে তথাকথিত Synthetic Theory বা বিবর্তনের নব্য ডারউইন তত্ত্ব তৈরী করা হয়’, যা Neo-Darwinism বা ‘নব্য ডারউইনবাদ’ নামে খ্যাত হয়েছে। এর মাধ্যমে ডারউইনবাদীরা আবার উঠে দাঁড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে।[১৬]

ডারউইনের তত্ত্ব বোঝার আগে একটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, তিনি স্বল্প পর্যবেক্ষণ এবং সামান্য কিছু তথ্য থেকে

১২. Mayr, Ernst, One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought (Harvard University Press : 1991), pp. 36–48।
১৩. রাফান আহমেদ, হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি (ঢাকা : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০২১), পৃ. ৪২-৫০।
১৪. Darwin, Charles, On the Origin of Species (London: John Murray, 1859), Chapter 14, pp. 484.
১৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, বিবর্তনবাদ, পৃ. ২১।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

বিশাল মহা দাবীতে লাফ দিয়েছেন। তার তত্ত্ব মূলত বিজ্ঞান নয়, বরং একটা দর্শন। তিনি পরীক্ষিত তেমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেননি, বরং নিজের ব্যক্তিগত ধারণার কথাই বারাংবার উল্লেখ করেছেন। যেমন ডারউইনের বইয়ের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বৃটিশ বিজ্ঞানী L. M. Davies তত্ত্বটি সম্পর্কিত অনুমানের প্রায় ৮০০টি উদাহরণ গুনে বের করেছিলেন, যেখানে 'যদি', 'হ'তে পারে', 'হয়তো', 'সম্ভবত', 'হ'তেও পারে', 'পারে', 'ভাবা যেতে পারে'-র মতো শব্দ এবং প্রচুর কাল্পনিক উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে।[১৭] আমরা এখানে তার সেসব অনুমানমূলক দাবীগুলো খতিয়ে দেখব এবং বাস্তবতা যাচাই করার চেষ্টা করব।

১. প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব পর্যালোচনা :

ডারউইনের প্রধান দাবী হ'ল, পরিবেশের সাথে যে প্রাণী বেশী মানানসই, সে বেশী বংশবিস্তার করে। দুর্বল বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়, শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াতেই নাকি কোটি বছরে একটি মাত্র পূর্বপুরুষ থেকে পৃথিবীর সকল জীব তৈরী হয়েছে। এক্ষেত্রে তার প্রমাণ হ'ল, গ্যালাপাগোস দ্বীপের ফিঞ্চ পাখির ঠোঁটের আকার পরিবর্তন, অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া, কুকুরের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য ইত্যাদি। সন্দেহ নেই যে, এগুলো বাস্তবে বিবর্তনের কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করে, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন অণু-বিবর্তন (Micro-evolution)। এটি একটি প্রজাতির ভেতরকার পরিবর্তন, যা পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু এক প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তর, যেমন সরীসৃপ থেকে পাখি হওয়া, মাছ থেকে উভচর হওয়া, বানরজাতীয় প্রাণী থেকে মানুষ হওয়া এটা কখনোই পর্যবেক্ষণ করা হয়নি, পরীক্ষাগারে পুনরায় তৈরী করা যায়নি। ৪০০ মিলিয়ন বছরের ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষায়ও প্রজাতি পরিবর্তন হয়নি।[১৮]

অথচ ডারউইন Micro-evolution-এর এই অতি সীমিত পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণহীনভাবে বিশাল মহাদাবী করে বসেছেন যে, ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল জীব এই একই প্রক্রিয়ায় তৈরী। এটাকে বলা হয় মহা-বিবর্তন (Macro-evolution)। এভাবে তিনি অণু-বিবর্তনের প্রমাণ দেখিয়ে মহা-বিবর্তন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এটা ঠিক এরকম যুক্তির মত যে, 'আমি দেখেছি মানুষ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে পারে, সুতরাং মানুষ চাঁদেও যেতে পারে।' প্রথমটা সত্য, কিন্তু সেটা মোটেই দ্বিতীয়টার প্রমাণ বহন করে না।

বাস্তবে কালক্রমে ফিঞ্চ পাখির ঠোঁট পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ফিঞ্চ পাখি ফিঞ্চই থাকে, অন্য কোন পাখিও হয় না, কোন সরীসৃপ হয় না। কুকুর থেকে শাখা-প্রশাখা হিসাবে বিচিত্র প্রজাতি আসে কিন্তু কুকুর কুকুরই থাকে, অন্য কোন প্রাণী হয় না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য আনে, কিন্তু প্রজাতির মধ্যে রূপান্তর আনে না। পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী এমন কোন বাস্তব প্রমাণ দেখাতে পারেননি যে, কোন প্রাণীর এক প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তর (Macro-evolution) হয়েছে। এরকম কখনোই ঘটেনি, ঘটার ধারে-কাছেও যায়নি এবং কখনও ঘটার সম্ভবনাও নেই।[১৯]

অথচ নব্য ডারউইনবাদীরা এই তত্ত্ব নিয়েই মূলত তাদের যুক্তি খাড়া করে থাকে।[২০] বাস্তব কোন প্রমাণ না দেখাতে পেরে তারা বলে যে, 'মহা-বিবর্তন কোটি বছরে হয়েছে, তাই দেখা যাচ্ছে না'। কিন্তু এই যুক্তি বৈজ্ঞানিকভাবে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। যে তত্ত্ব নীতিগতভাবে পরীক্ষাযোগ্য নয়, সেটা তাদের মতেই বিজ্ঞান নয়; বরং ভ্রান্ত ধারণা আর অপবিজ্ঞান মাত্র। তারপরও এই অপ্রমাণিত তত্ত্ব বিশ্বের প্রতিটি পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে, ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের সন্তানদের কচি মাথায়। এটা কখনও বিজ্ঞানচর্চা নয়; বরং নাস্তিক্যবাদী সেক্যুলার মতাদর্শিক প্রতারণার এক নতুন রূপ।

দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক নির্বাচন কেবল পূর্ব থেকে বিদ্যমান কোন দুর্বল প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটাতে পারে, কিন্তু নতুন কোন জটিল শারীরিক কাঠামো বা নতুন জিনোম তৈরি করতে পারে না।[২১] এজন্য জীববিজ্ঞানী হুগো ডি ভ্রিজ গত শতকের শুরুতেই বলেছিলেন, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর এই তত্ত্ব যোগ্যতমদের টিকে থাকা (Survival of the Fittest) ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু যোগ্যতমদের আগমন (Arrival of the Fittest) ব্যাখ্যা করতে পারে না'।[২২]

তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক নির্বাচন নতুন কোন তথ্য তৈরী করতে পারে না। এমনকি বিদ্যমান জিনগুলো থেকে বাছাই করে একটিমাত্র নতুন জিন বা নতুন তথ্য সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তার নেই। এটা ডারউইনবাদের একটি মৌলিক দুর্বলতা।

বর্তমান শতাব্দীতে কেমব্রিজের প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং কেন্দ্রের গবেষক বায়োকেমিস্ট ডগলাস অ্যাক্স Journal of Molecular Biology-তে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী গবেষণায় এই অসম্ভাব্যতা গণিতের ভাষায় প্রমাণ করেছেন। তাঁর উপসংহার ছিল অকপট। তিনি বলেন, 'প্রতিটি নতুন জিন, প্রতিটি নতুন প্রোটিন ফোল্ড... কোন কিছুই ধারাবাহিক বিবর্তনের পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে বলে আমরা দেখাতে পারি না।

১৭. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ : ২০১১), পৃ. ৩৪।
১৮. G.A Kerkut, Implications of Evolution (Oxford: Pergamon Press, 1960), p. 157.
১৯. হোমো স্যাপিয়েনস : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি, পৃ. ৪২-৫০।
২০. Luskin, Casey. Alleged Instances of Observed Speciation. Science and Culture Today, July 2016. অনলাইন: www.scienceandculture.com/2016/07/alleged_instanc/.
২১. Stephen Jay Gould, The Episodic Nature of Evolutionary Change (New York: W.W. Norton, 1980), p. 182.
২২. Hugo De Vries, Species and Varieties: Their Origin by Mutation (Chicago: Open Court Publishing, 1905), p. 825.

এটা সবই মরীচিকা।'[২৩]

এই কথাগুলো বোঝার জন্য প্রোটিন সম্পর্কে সামান্য ধারণা দরকার। প্রোটিন হ'ল জীবনের মূল কর্মী। শরীরের প্রতিটি কাজ, হজম, শ্বাসক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ, জিনের পাঠোদ্ধার ইত্যাদি প্রোটিন সম্পন্ন করে। প্রোটিন তৈরী হয় অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল দিয়ে। পৃথিবীতে ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। এই ২০টি উপাদান বিভিন্ন ক্রমে সাজিয়েই তৈরী হয় প্রতিটি প্রোটিন। কিন্তু প্রোটিন শুধু শৃঙ্খল হ'লেই হয় না তাকে একটি নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক আকারে ভাঁজ হ'তে হয় (Protein Fold)। এই ভাঁজ না হ'লে প্রোটিন কোন কাজ করতে পারে না। আর ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের ১৫টি থেকে ২০০টির শৃঙ্খলে সম্ভাব্য সংমিশ্রণের সংখ্যা এতই বিশাল যে, পৃথিবীর বয়স ও মিউটেশনের হারের সাপেক্ষে এলোমেলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কোন কার্যকর প্রোটিন ফোল্ডে পৌঁছানো অসম্ভব।

অ্যাক্স তাঁর গবেষণায় পরিসংখ্যান দিয়ে গাণিতিকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এলোমেলো প্রক্রিয়ায় একটিমাত্র কার্যকর প্রোটিন ফোল্ড পর্যন্ত তৈরী হওয়ার সম্ভাবনাও যদি খোঁজা হয়, তবে সে সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। অথচ ডারউইনবাদ যুক্তিহীন ধারণার ভিত্তিতে বলছে এভাবেই নাকি লক্ষ লক্ষ প্রোটিন তৈরী হয়েছে। অথচ ঝড় এলে বাতাসে এলোমেলোভাবে একটি বোয়িং ৭৪৭ তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা যেমন শূন্য, সম্পূর্ণ নতুন প্রোটিন ফোল্ড নিছক মিউটেশনে তৈরী হওয়াও তেমনই অসম্ভব। কারণ সর্বনিম্ন জীবনের জন্যও প্রায় ৫০০ ধরনের প্রোটিন একসাথে প্রয়োজন।[২৪]

বিবর্তনবাদীরা জিন পুনর্মিলন (Gene Recombination) তত্ত্বের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, সমধর্মী প্রোটিনগুলো পুনর্মিলনের সুযোগ আছে এবং ইন্ট্রাজেনিক পুনর্মিলন নতুন প্রোটিন তৈরী করে যা কার্যকরীভাবে বৈচিত্র্যময় এবং সঠিকভাবে ভাঁজ হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা আছে।[২৫]

কিন্তু অ্যাক্স ও মেয়ার স্পষ্টভাবে এর জবাব দিয়েছেন যে, 'প্রোটিন বিবর্তন করতে পারে না। এক ধরনের ফোল্ড থেকে ভিন্ন ফোল্ডে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। পুনর্মিলন কেবল একই ধরনের প্রোটিনের মধ্যে প্রযোজ্য, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রোটিন ফোল্ড তৈরিতে নয়।'[২৬]

বিবর্তনবাদীরা আরো দাবী করে যে, প্রোটিন তৈরীর এই প্রক্রিয়া কোটি কোটি বছর সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন হয়েছে, তাই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। অ্যাক্স এই যুক্তির সরাসরি জবাব দিয়েছেন, 'ডারউইনবাদীরা সবসময় 'গভীর সুদীর্ঘ সময়ের' আশ্রয় নেন। আর এই কৌশলেই তারা মানুষকে বোকা বানানোর কাজটি করা যায়। কারণ মানুষ স্বভাবতই অনেক সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে ভাবে। মূলত কোটি বছর নয়, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর সময় দিলেও এই প্রক্রিয়া ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।'[২৭]

সর্বোপরি নব্য-বিবর্তনবাদীরা বহু চেষ্টা করেও অ্যাক্সের পরিসংখ্যানের নির্ভুলতা চ্যালেঞ্জ করতে পারেননি। তারা বিভিন্নভাবে কেবল তার প্রাসঙ্গিকতা সীমিত করার চেষ্টা করেছেন এবং তথাকথিত সম্ভাবনার সূত্র দিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিছক কল্পনা ছাড়া বাস্তবে কোন পরীক্ষাগারে বা পর্যবেক্ষণে এর সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়নি।

(ক্রমশঃ)

---

২৩. Douglas Axe, Estimating the prevalence of protein sequences adopting functional enzyme structures (London : Journal of Molecular Biology, 2004), 341(5), p. 1295-1315.

২৪. Douglas Axe, Undeniable: How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed (2016 : HarperOne).

২৫. N.Tokuriki, & D. S. Tawfik, Protein dynamic evolvability: the role of conformational diversity (2009 : Science), 324(5924), p. 203-207; S. Ohno, Evolution by Gene Duplication (1970 : Springer-Verlag).

২৬. S. C. Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design (2009 : HarperOne).

২৭. Douglas Axe, Defending Douglas Axe on the Rarity of Protein Folds (Science and Culture Today, November 2023). www.scienceandculture.com/2023/11/defending-douglas-axe-on-the-rarity-of-protein-folds.

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -*সম্পাদক*।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

হাদীছ অনুযায়ী আমল

-মূল (ফার্সী): মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

[১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোট ময়দানে মুজাহিদ আন্দোলনের সিপাহসালার সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর শাহাদাতের পর যিনি এই আন্দোলনের হাল শক্ত হাতে ধরেছিলেন, তিনি হ'লেন মর্দে মুজাহিদ মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী (রহ.)। তিনি জিহাদ আন্দোলনে যেমন একজন লড়াকু সৈনিক ছিলেন, তেমনি ইলমী ও কলমী ময়দানেও তাঁর বিচরণ ছিল অসামান্য ও অতুলনীয়। কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর অগাধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র লেখালেখিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে হাতে-কলমে হাদীছের উপর আমল প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বেগবান করতে তাঁর ভূমিকা ছিল অদ্বিতীয়। এই আন্দোলন পরিচালনায় দাওয়াত, তাবলীগ ও জিহাদের কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যেই মূলত তিনি তাঁর এই অমূল্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের হ'লেও হাদীছ অনুযায়ী আমল এবং তাক্বলীদ বিষয়ে এটি একটি সারগর্ভ ও অমূল্য রচনা। তদানীন্তন তাক্বলীদী সমাজে হাদীছের উপর আমল জাগরুক করতে পুস্তিকাটি দিশারীর ভূমিকা পালন করেছিল। পুস্তিকাটির হৃদয়গ্রাহী আবেদন ও ইলমী মূল্য বিবেচনায় আত-তাহরীক-এর পাঠকবৃন্দের জন্য এর বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হ'ল]

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা মহান পথপ্রদর্শক আল্লাহ্র, যাঁর কুরআনের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোর পথ দেখায়। অসংখ্য দরূদ বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও নেতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যাঁর পবিত্র বাণীসমূহ রোগাক্রান্ত হৃদয়ের রোগ নিরাময়কারী এবং রূহের কষ্ট দূরকারী। তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যাঁরা সাহসী পদক্ষেপের সাথে আনুগত্যের ময়দানে টিকে থেকে গুমরাহীর অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং মৃত হৃদয় থেকে জীবন ফিরে পেয়েছেন। হামদ-নাতের পর পুস্তিকাটি লেখার প্রেক্ষাপট তুলে ধরছি।

হাদীছের অনুসরণ করব, না ফিক্বহের অনুসরণ করব তা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবরা এই অকিঞ্চনকে অধিক হারে প্রশ্ন করে। ফলে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি পুস্তিকা লেখার তাকীদ অনুভব করি। সেই তাকীদের বাস্তব রূপ এ পুস্তিকা। আশা করি পুস্তিকাটি যে কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের খোরাক হবে এবং বার বার জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার কষ্ট থেকে আমাকেও রেহাই দেবে। সাথে সাথে তা বন্ধুদের মাঝে আমার স্মৃতিস্মারক হয়ে থাকবে। পুস্তিকাটিকে আমি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। পুস্তিকাটির নাম রাখা হয়েছে 'আমল বিল হাদীছ' বা হাদীছ অনুযায়ী আমল।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফিক্বহের ক্ষেত্রে ইস্তিহসান[১] প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ– 'তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট দল দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বের হয় না' *(তওবা ৯/১২২)*। অর্থাৎ মুসলিমদের প্রত্যেকটি দলের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠীর দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে 'ফাক্বাহাত' অর্জন করা যরূরী। এ আয়াত 'ফাক্বাহাত' বা গভীর জ্ঞান অর্জন ফরয (আবশ্যিক) হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। ফাক্বাহাত সম্পর্কে এ ধরনের আয়াত ও হাদীছের সংখ্যা আরো অনেক আছে। কুরআন ও হাদীছে শরী'আতের যেসব আহকাম বা বিধান সরাসরি উল্লেখ নেই সেগুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সাথে সংগতি রেখে সঠিক শারঈ বিধান উদঘাটন ও অনুধাবন করাকে 'ফাক্বাহাত' বলে।

যেমন–একজন অনুগত দাস তার মনিবের সান্নিধ্যে থেকে, মনিবের নির্দেশাবলী শুনে এবং দীর্ঘদিন সেবা করার সুবাদে তার মন-মানসিকতা ও পসন্দ-অপসন্দ গভীরভাবে বুঝে ফেলে। ফলে তার যোগ্যতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মনিব যদি তাকে নিজের কাছ থেকে আলাদা করে দেয় এবং তার অনুপস্থিতিতে এমন কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার সমাধান সে সরাসরি মনিবের মুখে শোনেনি; তবুও মনিবের মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকার কারণে সে কাজটি মনিবের সন্তুষ্টি অনুসারেই আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়। এটাকেই 'ফাক্বাহাত' বলে। এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। মনিবের মন বুঝতে পারা তথা 'ফাক্বাহাত' অর্জনকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র কাছেও মর্যাদা, সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কুরআন-সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধের বিভিন্ন স্তর যেমন: ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব, মুবাহ, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদির বিধান বুঝতে পারা ফাক্বাহাতের অন্তর্ভুক্ত। আহকামের এই স্তরসমূহ ঠিকমতো বুঝতে না পারলে কোন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে মহামহিম আল্লাহ্র আনুগত্যের বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা সব ধরনের আদেশ ও নিষেধ একসাথে পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অবশ্যই অপরিহার্য বিষয়গুলোকে অনাবশ্যক বিষয় থেকে পৃথক করে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অপরিহার্য বিষয়গুলো গ্রহণ করতে হবে।

দ্বীনে ফিক্বহের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, শারঈ বিধানাবলীর অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য অনধাবন করা। তবে এ ধরনের জ্ঞান চর্চাকারীদের কেবল 'ফকীহ' বলা হয় না; বরং এই সত্য ও রহস্যের জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদার কারণে একে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একইভাবে ফিক্বহের অন্যতম অংশ হ'ল আরবী ভাষার নানাবিধ প্রয়োগ ও অলঙ্কার নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা। যেমন-শব্দ কখন তার প্রকৃত অর্থে (حقيقة) আর কখন রূপক অর্থে (مجاز) ব্যবহৃত হয়েছে, কিংবা কোথায় নির্দেশের কঠোরতা (تشديد) রয়েছে, কোথায় অধিক গুরুত্বারোপ (تغليظ) করা হয়েছে আবার কোথায় উৎসাহ (ترغيب) প্রদান বোঝানো হয়েছে। এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। দ্বীনের এই গভীর প্রজ্ঞা ও ফিক্বহের প্রকৃত প্রতিফলন স্পষ্টভাবে দেখা যায়

---

১. ইস্তিহসান (استحسان) : সার্বিক কোন দলীলের বিপরীতে কোন বিশেষ আংশিক কল্যাণকর বিষয়কে (মাছলাহাত) গ্রহণ করাকে ইস্তিহসান বলে।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালেক (রহঃ) সহ তাঁদের অধিকাংশ অনুসারীদের মধ্যে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন!

প্রারম্ভিক যুগে যখন হাদীছ সংকলন হয়নি তখন এসব বুযুর্গ মনীষী সকল জায়গা থেকে হাদীছ যাচাই করে তা থেকে মাসআলা নির্ণয় করতেন এবং হাদীছ ও তার সনদ সংগ্রহে যারপরনাই চেষ্টা করতেন। এর মাধ্যমে তাঁরা মহান আল্লাহ্র দরবারে মর্যাদা ও উচ্চ আসন লাভ করেছেন। তাই তাঁদের প্রতি অন্তরে ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করা অপরিহার্য এবং তাঁদের অনুসারীদেরও আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য করা উচিত। কিছু লোক এমন আছে যাদের চিন্তাশক্তি মরে গেছে। তারা বাহ্যিক রূপ দেখে প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারেনি। নিজেদের মূল্যবান সময়কে দুনিয়া হাছিলের পিছনে বরবাদ করেছে। চিন্তা-গবেষণার ময়দানে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ফলে তারা চোরের মতো চেনা-অচেনা প্রত্যেকের অর্জিত সম্পদের দিকে নজর দেয় এবং অন্ধের মতো প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও নির্বোধের কাঁধে হাত রাখে। তারা কুরআন-হাদীছ পাঠ করা এবং তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছে। বইয়ে যা কিছু লেখা পায় চাই তা কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী হোক কিংবা বিরোধী হোক কোন বাছ-বিচার ছাড়াই গ্রহণ করে নেয়। তাদের মধ্যে কিছু লোক তো কুরআন-হাদীছের একটা পাতা উল্টিয়েও দেখে না। কেউ যদি দেখেও তবে তার মর্মার্থ নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে না। আর যারা মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা করে তারা শুধু ক্বিয়ামত, বারযাখ, দুনিয়াত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ক বিষয়াদি জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

শারঈ আহকাম বা বিধি-বিধান নিয়ে চিন্তা-গবেষণায় তারা আদৌ মন দেয় না। এ বিষয়ে তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, আগেকার মুজতাহিদ ফক্বীহগণ আহকাম নির্ণয়ের কাজ শেষ করে গেছেন, এখন আর তার কোন আবশ্যকতা নেই। বরং যদি কখনো তারা কুরআন ও হাদীছে তাদের বিশ্বাসযোগ্য বইগুলোর বিপরীত কোন বিধান দেখতে পায়, তবে কেউ কেউ কুরআন ও হাদীছের এমন ব্যাখ্যা (تَأْوِيل) করে যেন তা তাদের বইয়ের অনুকূলে চলে আসে। তারা এতটুকুও বুঝতে চায় না যে, কুরআন-হাদীছের অনুসরণই জীবনের আসল উদ্দেশ্য, কোন কিতাব কিংবা মাযহাবের আনুগত্য করা নয়। আবার কেউ কেউ সেই স্থান থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা এড়িয়ে চলার পথও অবলম্বন করে। এমন ফক্বীহদের সম্পর্কে সত্যবাদী ও সত্য সংবাদদাতা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ 'অনেক ফিক্বহের (জ্ঞানের) বাহক এমন আছেন, যারা নিজেরা ফক্বীহ (জ্ঞানী) নন'।[২] আল্লাহ পাক আমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন! অতএব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোথায় তাক্বলীদ করা জায়েয এবং কোথায় জায়েয নয় এ বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জায়েয ও নাজায়েযের নিরিখে তাক্বলীদ

জেনে রাখা উচিত যে, যদি সাধারণ মানুষ বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে লেখালেখি ও পড়ালেখা থেকে দূরে থাকে, কেবল আলেমদের থেকে জেনে নেওয়ার ওপর নির্ভর করে, তবে তার জন্য উপযুক্ত হ'ল এমন মুহাদ্দিছ ও দ্বীনদার আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করা; যারা তাদের দ্বীনদারী, আল্লাহভীতি এবং কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ। তার নিকট এভাবে প্রশ্ন করবে যে, আমাদেরকে এই মাসআলায় সুন্নতে মুহাম্মাদী শিক্ষা দিন। আর যদি সে ব্যক্তি শিক্ষার্থী (طالب علم) হয় এবং তার অন্তরে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ থাকে, তবে উপযুক্ত হ'ল প্রথমে সে কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন করবে; অতঃপর অন্যান্য কিতাবগুলোর দিকে মনোনিবেশ করবে। যাতে তার কাছে আয়নার মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন বুযুর্গের রায় কোন স্থানে সঠিক হয়েছে এবং কোথায় ভুল রয়েছে।

সুতরাং যে মাসআলা কুরআন ও হাদীছে সাফ সাফ পাবে তাতে কোন মুজতাহিদের তাক্বলীদ করবে না। কেননা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত মাসআলায় ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, তিনি হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমার সামনে যখন কোন মোকদ্দমা আসবে তখন তুমি কিভাবে বিচার করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে বিচার করব। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ্র কিতাবে না পাও? উত্তরে বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত অনুসারে করব। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাতেও না পাও? তিনি বললেন, নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ (চিন্তা-গবেষণা) করব, কোন ত্রুটি করব না। তাঁর কথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনন্দিত হয়ে প্রশংসা করলেন।[৩]

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছে কোন বিধান পরিষ্কার পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইজতিহাদের অবকাশ নেই। আর যদি মুজতাহিদদের গ্রন্থে কুরআন-হাদীছের খেলাফ কোন কথা পাওয়া যায় তবে তা উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে কুরআন-হাদীছ আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য। অন্যথায় মুজতাহিদগণের বক্তব্যের কারণে কুরআন ও হাদীছের বিধান রহিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছিলেন ইজতিহাদের পথের পথিকদের পথপ্রদর্শক। তাঁর থেকে দু'টি উক্তি বর্ণিত আছে। উক্তি দু'টি যেন দ্বীনরূপী গৃহের দুটি বৃহৎ স্তম্ভ। প্রথম উক্তি: 'যদি আমার কোন কথা হাদীছের বিরোধী পাও তবে তা দেয়ালে ছুঁড়ে মেরো'।[৪] এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীছের বিপরীতে ইমামের কথা মানলে ইমাম ছাহেবের কথামতই ঐ তাক্বলীদকারী নিজ ইমামের তাক্বলীদের গণ্ডী

---

২. আবুদাউদ হা/৩৬৬০; তিরমিযী হা/২৬৫৬; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৬।

৩. আবুদাউদ হা/৩৫৯২; তিরমিযী হা/১৩২৭। আল্লামা আলবানী প্রমুখ হাদীছটির সনদ যঈফ বলেছেন। কিয়াসের বৈধতার দলীলে কিন্তু আহমাদ মোল্লা জীউনসহ আরো অনেকে এ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। (নূরুল আনওয়ার 'কিয়াস' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৪. ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী, ঈক্বাযু হিমাম, পৃ. ৫০।

থেকে বেরিয়ে যাবে। এমন আমলকারী তখন আর হানাফী থাকবে না। দ্বিতীয় উক্তি: ‘আমার কথা অনুযায়ী আমল করা কারো জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয হবে না, যতক্ষণ না সে জানবে যে, এ কথা আমি কোত্থেকে বলেছি’।[৫]

এত্থেকে বোঝা যায় যে, কোন দলীল না জেনে অন্ধভাবে ইমামের মত আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর বক্তব্যের পক্ষে দলীল ও ক্বিয়াসের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কখনোই সেই ইমামের পসন্দনীয় নয়। আর সেই ইমাম দুনিয়ায় এই দু’টি কথা বলার কারণে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ‘আমি এরূপ বলে থাকলে আপনি অবশ্যই তা জানবেন। আমার অন্তরে যা গোপন আছে আপনি তা জানেন, কিন্তু আপনার গুপ্ত বিষয় আমি জানি না। নিশ্চয়ই যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ে আপনি সম্যক জ্ঞাত’ *(মায়েদাহ ৫/১১৬)*।

আর মুক্বাল্লিদরা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিস্তার পাবে না। তোমরা কি দেখ না, ইমামদের শিষ্যগণ যেসব মাসআলায় ইমামদের দলীলে আশ্বস্ত হ’তে পারেননি সেসব মাসআলায় তারা ইমামদের মত পরিহার করে ভিন্ন মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ তো ইমাম আবু হানীফার বিপরীতে এত পরিমাণ মাসআলা বলেছেন যে, তাকে একটি স্বতন্ত্র মাযহাব আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। আর পরবর্তী যুগের আলেমগণ পূর্ববর্তী আলেমদের অনেক বক্তব্য বাতিল করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হ’ল, যে বক্তব্য কুরআন ও হাদীছ বিরোধী তা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা বা সংকোচ করা উচিত নয়। বহু আলেম সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় এ বিষয়ে বলেছেন। জায়গা সংকীর্ণ হওয়ায় তাদের কথা উল্লেখ করা সম্ভব হ’ল না। তাছাড়া হাদীছসমূহ সনদবিশিষ্ট, অথচ মুজতাহিদদের বাণীসমূহ সনদহীন। তাহক্বীক্ব বা গবেষণা করার অন্যতম শর্তই হ’ল, সনদে উল্লেখিত রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) অবস্থা, তাঁদের বিশ্বস্ততা ও খ্যাতি বর্ণনা করা। কিন্তু মুজতাহিদদের কথার কোন সনদ নেই এবং তাদের মতামত তুলে ধরার সময় কোন সনদ উল্লেখ করাও হয় না। ইমামদের কার কাছ থেকে তা শোনা হয়েছে, তাঁর থেকে কে বর্ণনা করছেন, আর সেই বর্ণনাকারীদের অবস্থা-ই বা কী?

অতএব, যে পর্যন্ত কোন উক্তির সনদ উল্লেখিত শর্তাবলী অনুযায়ী প্রমাণিত না হয়, সে পর্যন্ত সেই উক্তির কীইবা মূল্য থাকতে পারে? কে জানে এটা ইমাম ছাহেবের উক্তি নাকি অন্য কেউ মনগড়াভাবে তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে? যেমন অনেক নাদান এই বিশ্বাসে ইমাম আবু হানীফার নামে অনেক কাল্পনিক ও নির্জলা মিথ্যা কথা চালিয়ে দিয়েছে যে, লোকেরা তাকে কামেল মুত্তাকী মনে করবে। কিছু বুযুর্গ এ ধরনের অন্ধ মুক্বাল্লিদদের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

تقلید دوسہ مقلد بیمعنی+بدنام کند نام جوان مردان را

‘দুই-তিনজন নির্বোধ মুক্বাল্লিদের অন্ধ তাক্বলীদ
বীরপুরুষদের সুনামকেও কলঙ্কিত করে দেয়’।

আর সনদ যদি যরূরীই না হ’ত তবে হাদীছের সনদ যাচাই নিয়ে অহেতুক কষ্ট করার দরকার কি ছিল? তাছাড়াও সকল আলেম এককথায় একমত যে, মুজতাহিদের রায় কখনো ভুল হয় আবার কখনো শুদ্ধ হয়। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীছ যা সনদযুক্ত ও নিষ্পাপ রাসূলের বাণী, তার বিপরীতে যে উক্তি সনদহীন এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিছু হাদীছ ও মুজতাহিদদের উক্তির মধ্যে কেন অমিল দেখা যায়, তার কারণ মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। এই ছোট্ট পরিসরে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর হাদীছসমূহ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিতে ও মুখে মুখে সংরক্ষিত ছিল। মনীষীগণ ভুলে যাওয়া, জাল হাদীছ রচনা ও হাদীছ বদলে দেওয়ার ভয়ে কিতাবে তা সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রত্যেক মুজতাহিদ ইমাম তাঁর সামর্থ্য ও তাওফীক অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন হাদীছ যাচাই করে সেগুলো তাঁদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। পরিশেষে সেই যুগ আসল, যখন ছিহাহ (বিশুদ্ধ হাদীছগ্রন্থসমূহ) ও অন্যান্য কিতাব রচিত হ’ল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নববী ইলমের পূর্ণ সংকলন আত্মপ্রকাশ লাভ করল এবং নতুন করে হাদীছ তাখরীজের কাজ স্থগিত হয়ে গেল। সকল হাদীছের প্রামাণ্যতা নির্ণীত বলে গণ্য হওয়ার পর এবং গোনাগুনি শেষে تَقَدَّمَ الْفَضْلُ لِمَنْ তথা ‘পূর্বে আগমন কারীদেরই শ্রেষ্ঠত্ব’ এই নিয়মানুযায়ী তা পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিছদের হাতে এসে পড়ল। যদিও এই ক্ষেত্রে সনদ অনুসন্ধান ও হাদীছ সংকলনের প্রচেষ্টার ছওয়াব পূর্ববর্তী আলেমদের জন্য সর্বাধিক; কিন্তু হাদীছের জ্ঞান অধিক পরিমাণে অর্জনের ফযীলত পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিছগণ লাভ করেছেন। *(ক্রমশ:)*

দারুস সুন্নাহ শপ
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
যোগাযোগ করুন :
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪
অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop
সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন (নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

৫. *হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন, ৬/২৯৩ পৃ.।*

ফজর ছালাতের গাফিলতি : পরিণাম ও প্রতিকার

-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ

ভূমিকা :

রাতের নিকষ কালো আঁধার পেরিয়ে যখন ফজরের স্নিগ্ধ আলো পৃথিবীর বুকে উঁকি দেয়, তখন সমগ্র প্রকৃতি যেন এলাহী প্রশান্তির আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয় মুয়ায্যিনের সুমধুর আহ্বান। যারা নিদ্রার কোমলতা, ভোরের নীরবতা, আর দেহের অলসতাকে পদদলিত করে আযানের আহ্বানে সাড়া দেন এবং ফজরের জামা‘আতে শামিল হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযিরা দেন, তারা যেন প্রতিটি প্রভাতে নিজেদের ঈমানকে নবরূপে জাগিয়ে তোলেন। জীবনকে বরকত ও রহমতের ফল্গুধারায় সিক্ত করেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ ও বেদনার বিষয় হ’ল, আধুনিক সভ্যতার এই যুগে আমাদের অনেকের কাছে এই ফজরের ছালাতই যেন সবচেয়ে অবহেলিত, সবচেয়ে উপেক্ষিত ইবাদতে পরিণত হয়েছে। ফলে আমরা হারাচ্ছি আত্মিক প্রশান্তি, বরকতের প্রাচুর্য, স্বাস্থ্যগত নানাবিধ উপকারিতা এবং পরকালীন সফলতার বহু দরজা। আমরা প্রতিনিয়ত ফজরের ব্যাপারে যে মারাত্মক গাফিলতি ও অলসতা প্রদর্শন করছি, এর মাধ্যমে নিজেদের অজান্তেই ঈমান বিধ্বংসী মুনাফিকী স্বভাব এবং ভয়াবহ শাস্তির দিকে পা বাড়াচ্ছি।

ফজর ছালাতে গাফিলতির পরিণাম ও ভয়াবহতা

১. মুনাফিকের স্বভাব :

ঈমানের দাবী করা খুব সহজ, কিন্তু সেই দাবীর পক্ষে আমল করা বড়ই কঠিন। আর একজন মুসলিমের ঈমানের পারদ মাপার সবচেয়ে বড় থার্মোমিটার হ’ল ফজরের ছালাত। মুনাফিক্বী এমন এক ভয়াবহ আধ্যাত্মিক ব্যাধি, যা মানুষের ভেতরটাকে নীরবে ধ্বংস করে দেয়। আমাদের মধ্যে এই ব্যাধি বাসা বাঁধছে কি-না, তা যদি আমরা যাচাই করতে চাই, তবে দেখতে হবে আমরা নিয়মিত ফজরের জামা‘আতে উপস্থিত হ’তে পারছি কি-না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، ‘মুনাফিকদের উপর ফজর ও এশার ছালাতের চেয়ে অধিক ভারী (কঠিন) ছালাত আর নেই। যদি তারা জানত যে এই দুই ছালাতের মাঝে কি (বিশাল পুরস্কার) রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হ’লেও এতে উপস্থিত হ’ত’।[1] ইমাম ছান‘আনী (১০৯৯-১১৮২ হি./১৬৮৮-১৭৬৮ খ্রি.) বলেন, ‘অত্র হাদীছে ফজর ও এশার জামা‘আতে উপস্থিত হওয়ার প্রতি অত্যন্ত জোরালো উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কারণ একজন মুমিন যখন এ দুই ছালাতের মাহাত্ম্য ও প্রতিদান সম্পর্কে জানতে পারে, তখন যে কোন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে তা আদায় করতে ছুটে আসে। পক্ষান্তরে মুনাফিকদের ক্ষেত্রে এ দুই ছালাতে অনুপস্থিত থাকার মূল কারণ হ’ল– এগুলোর অশেষ মর্যাদা ও প্রতিদানের প্রতি তাদের অবিশ্বাসী মনোভাব বা ঈমানের দুর্বলতা’।[2]

বর্তমান যুগে আমাদের জীবনযাত্রা অনেকটাই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। সারাদিন অফিস, ব্যবসা বা পড়াশোনার চাপ শেষে ঘরে ফিরে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুবে থাকি, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ফলে ফজরের সময় ওঠা যেন পাহাড় ঠেলার মতো কঠিন মনে হয়।

মহিলারাও এই ফেৎনা থেকে মুক্ত নন। সারাদিন সংসারের হাযারো কাজ, সন্তান সামলানো এবং পরিবারের সবার যত্ন নিতে নিতে যখন তিনি রাতে বিছানায় যান, তখন শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে আসে। কিন্তু একজন মুমিনা নারী সেই ক্লান্তি জয় করে শুধু নিজেই ফজর ছালাতে দাঁড়ান না, বরং পরম মমতায় তাঁর স্বামী ও সন্তানদেরও জাগিয়ে তোলেন। কারণ তিনি জানেন, পরিবারের এই ভোরের সংস্কৃতিই তাদের জান্নাতের পথে এগিয়ে নিবে।

সালাফে ছালেহীনের যুগে ফজর ছালাতের প্রতি গুরুত্ব কেমন ছিল তা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর একটি উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি আগামীকাল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার সাথে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসাবে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হ’তে চায়, সে যেন যেখানে আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে) সেখানে গিয়ে এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করে।... আমরা তো আমাদের যুগে দেখেছি, স্পষ্ট মুনাফিক্ব ব্যতীত কেউ জামা‘আত থেকে পিছনে থাকত না। এমনকি এমনও দেখা গেছে যে, (অসুস্থতার কারণে) একজন মানুষকে দু’জনের কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে মসজিদে আনা হ’ত এবং তাকে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’ত’।[3]

একটু চোখ বন্ধ করে ছাহাবায়ে কেরামের যুগের সেই দৃশ্যটি কল্পনা করুন! অসুস্থতায় ধুঁকতে থাকা একজন মানুষ, যার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর শক্তি নেই, তাকে দু’জন মানুষ দুই দিক থেকে কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে মসজিদে নিয়ে আসছেন! কেন? কারণ তাঁরা মনে করতেন ফজর বা এশার জামা‘আত থেকে কেবল মুনাফিকরাই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে। আর আজ আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়েও ফজরের সুমধুর আযান শুনে পাস ফিরে ঘুমাই! অ্যালার্ম বাজলে তা বন্ধ করে আবার ঘুমের গভীরে হারিয়ে যাই। আমাদের বিবেক একটুও দংশন করে না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ، ‘আমরা যখন কাউকে এশার ও ফজরের ছালাতে অনুপস্থিত দেখতাম, তখন তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতাম (অর্থাৎ তাকে

---

১. *বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১।*

২. *মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আমীর ছান‘আনী, সুবুলুস সালাম, ১/৩৬০।*
৩. *আবূদাঊদ হা/৫৫০; নাসাঈ হা/৮৪৯; মিশকাত হা/১০৭২; সনদ ছহীহ।*

মুনাফিকী বা ঈমানের দুর্বলতার আশঙ্কায় দেখতাম)'।[৪]

২. সার্বিক জীবনে শয়তানের প্রভাব :

বর্তমান যুগে মানসিক অবসাদ, বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশন যেন এক মহামারীর রূপ নিয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনেকে কারণ ছাড়াই মেজাজ খিটখিটে করে রাখেন, সারাদিন কাজে কোন এনার্জি পান না, এক ধরনের অলসতা আর ক্লান্তি তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। আধুনিক বিজ্ঞান হয়তো এর নানা জাগতিক কারণ খুঁজবে, কিন্তু চৌদ্দশ বছর আগে আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) এর আসল আধ্যাত্মিক কারণটি উন্মোচন করে গেছেন। ফজর না পড়া মানুষের দিনটি শুরুই হয় শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও মনস্তাত্ত্বিক দাসত্বের মধ্য দিয়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ، 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঠে সে এই বলে চাপড়ায় যে, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমিয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, একটি গিঁট খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আর একটি গিঁট খুলে যায়। অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরো একটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলূষ কালিমা ও আলস্য সহকারে'।[৫]

অধিকাংশ সময় আমরা অ্যালার্ম বেজে ওঠার পর যখন 'স্নুজ' (Snooze) বাটনে চাপ দিয়ে ভাবি- 'আর মাত্র পাঁচটা মিনিট ঘুমাই', ঠিক তখনই শয়তান আমাদের ঘাড়ে ঐ গিঁটগুলো ধরে টান দেয় আর ফিসফিস করে বলে, 'এখনও অনেক রাত বাকী, ঘুমাও'। যারা শয়তানের এই ধোঁকায় পড়ে যায়, তাদের পরিণতি ভয়াবহ ও অপমানজনক হয়ে ওঠে। মা-বোনদের জীবনেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমন অনেক মা-বোন আছেন, যেদিন আপনি ফজর পড়তে পারেন না, সেদিন সকালে উঠেই তিনি এক অজানা অস্থিরতা অনুভব করেন। বাচ্চাদের ওপর অকারণে রাগ ঝাড়েন, সংসারের কাজে একঘেঁয়েমী লাগে। অথচ যেদিন তিনি ফজরের আযানে উঠে পড়েন, ওযূ করে মুছাল্লায় (জায়নামাযে) বসেন, সেদিন পুরো ঘরটা রহমতের ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। প্রশান্ত মনে সারাদিন পরিবারকে তিনি ভালোবাসায় আগলে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকট এমন এক লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করা হ'ল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ 'সে এমন লোক যার উভয় শয়তান কানে পেশাব করে দিয়েছে'।[৬] গভীরভাবে ভাবনন তো, এটি কত বড় লাঞ্ছনার বিষয়! কোন মানুষ যদি আমাদের গায়ে একটু থুথু বা ময়লা ছিটিয়ে দেয়, আমরা অপমানে-রাগে ফেটে পড়ি। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব বা 'আশরাফুল মাখলূকাত' হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ফেরেশতারা এক সময় আমাদের পিতা আদম (আ.)-কে সিজদা করে সম্মান জানিয়েছিলেন। আর আজ সামান্য ঘুমের কাছে পরাজিত হয়ে আমরা সেই অভিশপ্ত শয়তানকে আমাদের কানে পেশাব করার সুযোগ করে দিচ্ছি। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম কখনোই এই জঘন্য অপমান মেনে নিতে পারে না।

৩. আমল ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা : বুরায়দাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দিল, তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেল'।[৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 'যদি কোন ব্যক্তির 'আছরের ছালাত ছুটে যায়, তাহ'লে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল'।[৮]

এই হাদীছের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম আবূ সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী (৩১৯-৩৮৮ হি.) বলেন, 'وُتِــرَ' শব্দের অর্থ হ'ল, কোন কিছু কমে যাওয়া বা কেড়ে নেওয়া। অর্থাৎ মানুষ তার পরিবার-পরিজন ও সম্পদ হারিয়ে যেমন একাকী ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তেমনি যে ব্যক্তির আছরের ছালাত ছুটে যায়, সে যেন এমন ক্ষতিরই সম্মুখীন হয়। উদ্দেশ্য হ'ল, একজন মুসলিমের কাছে আছরের ছালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা তার পরিবার ও সম্পদ হারানোর আশঙ্কার মতোই ভয়াবহ হওয়া উচিত'।[৯]

প্রশ্ন জাগতে পারে, ফজর ছালাতের আলোচনায় আছরের কথা কেন বলা হ'ল? এর উত্তর দিয়ে ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (৩৬৮-৪৬৩ হি.) বলেন, 'অত্র হাদীছে যদিও আছরের ছালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এর উদ্দেশ্য হ'ল সব ছালাত। কেননা সকল ফরয ছালাতের মর্যাদা ও পবিত্রতা সমান'।[১০] বরং দিনের শুরু হিসাবে ফজরের ছালাত আছরের চেয়েও অধিকতর ফযীলতপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং এক ওয়াক্ত আছরের ছালাত পরিত্যাগের পরিণতি যদি এমন সর্বনাশা হয়, তবে দিনের প্রথম ছালাত অর্থাৎ ফজরের ছালাত, যা স্বয়ং ফেরেশতাদের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তা পরিত্যাগের পরিণতি আরও কত ভয়াবহ হ'তে পারে!

---

৪. ইবনু খুযায়মাহ হা/১৪৮৫; ছহীহুত হা/৪১৭, হাদীছ ছহীহ ।
৫. বুখারী হা/১১৪২; মুসলিম হা/৭৭৬; মিশকাত হা/১২১৯।
৬. বুখারী হা/৩২৭০; মুসলিম হা/৭৭৪।
৭. বুখারী হা/৫৫৩; মিশকাত হা/৫৯৫।
৮. বুখারী হা/৫৫২; মুসলিম হা/৬২৬।
৯. খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান, ১/১৩১।
১০. ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ, তাহকীক: বাশশার আওয়াদ মা'রূফ ও অন্যান্য (লন্ডন : মাকতাবাতুল ফুরক্বান, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৯ হি./২০১৭ খ্রি.), ৯/২৯।

৪. দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার আলামত :

ফজর ছালাতে নিয়মিত অবহেলা নিছক কোন অলসতা বা বদভ্যাস নয়, বরং এটি হ'ল আখেরাতের অনন্ত জীবনের ওপর এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত। আমরা মুখে যতই বলি না কেন পরকালই আমাদের আসল ঠিকানা, আমাদের সকালবেলার এই আচরণ প্রমাণ করে যে, আমরা মূলত দুনিয়াকেই বেশী ভালোবাসছি। মহান আল্লাহ বলেছেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، 'বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখেরাত হ'ল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী' *(আল-আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*। ইমাম আবুস সঊদ আল-ইমাদী (৮৯৬-৯৮২ হি.) বলেন, 'পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া বলতে বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ও তাতেই প্রশান্তি খুঁজে নেওয়া। আর আখেরাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া'।[১১]

আমরা সারাদিনের অফিস, ব্যবসা কিংবা লেখাপড়ার ব্যস্ততা শেষে রাতে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেই। অতঃপর ভোরের নীরবতা ভেঙে যখন ফজরের আযান হয়, তখন আমরা ভাবি– 'আরেকটু ঘুমাই, নইলে সকালে অফিসে কাজে ব্যাঘাত ঘটবে' কিংবা 'ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারব না'। এই যে দুনিয়াবী কাজের ক্ষতি হওয়ার ভয়ে আমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানকে উপেক্ষা করলাম, এটাই কি আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া নয়?

মহান আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، 'আর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৩৯)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন, قَدَّمَهَا عَلَى أَمْرِ دِينِهِ وَأُخْرَاهُ، 'সে তার দ্বীন ও আখেরাতের বিষয়গুলোর ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে'।[১২] জামালুদ্দীন কাসেমী (১২৮৩-১৩৩২ হি.) বলেন, 'পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হ'ল, সে আখেরাতের সম্মান, মর্যাদা এবং সেখানে নেককারদের জন্য প্রস্তুতকৃত অফুরন্ত নে'মতের পরিবর্তে দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী ও প্রবৃত্তির কামনাকেই অগ্রাধিকার দিল'।[১৩]

ধরুন, আপনার অফিসের বস বা কোম্পানির মালিক আপনাকে ফোন করে বললেন, 'আগামীকাল ভোর ৫টায় অফিসে একটি বিশেষ মিটিং আছে। উপস্থিত থাকতে পারলে আপনার বেতন দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে'। বলুন তো, আপনি কি সেদিন অ্যালার্ম বাজার পর তা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকবেন? কখনোই না! আপনি সারা রাত উত্তেজনায় ঠিকমতো ঘুমাতেই পারবেন না। ব্যাপারটা যদি এমনই হয়, তবে কি এটা প্রমাণিত হচ্ছে না- আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে দুনিয়ার বসের মূল্য বেশী? জান্নাতের চিরস্থায়ী নে'মতের চেয়ে দুনিয়ার কাগজের নোটের মূল্য বেশী? পরিবারের মা-বোনদের ক্ষেত্রেও একই কথা। সকালে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে হবে বা স্বামীর অফিসের জন্য নাস্তা বানাতে হবে– এই চিন্তায় একজন মা বা স্ত্রী ঠিকই ভোরে উঠে পড়েন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হ'ল, সেই একই মহিলা যখন ফজরের আযান শোনেন, তখন তিনি বিছানা ছাড়তে পারেন না। এর অর্থ কি এই নয় যে, আমাদের কাছে জান্নাতের চিরস্থায়ী আরামের চেয়ে দুনিয়াবী স্বার্থের মূল্য অনেক বেশী হয়ে গেছে?

৫. কবরে ভয়ঙ্কর আযাব :

যারা ফজর ছালাত ত্যাগ করে ঘুমিয়ে থাকে, কবরের জীবনে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। ছাহাবী সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল এবং বলল, চলুন! আমি তাদের সঙ্গে চলতে থাকলাম। তিনি বলেন, وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، 'আমরা চিত হয়ে শুয়ে থাকা এক লোকের কাছে আসলাম। দেখলাম, অন্য এক লোক তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এরপর আবার সে পাথরটি নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত ভাল হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার তেমনি আচরণ করে, যেরূপ প্রথমবার করেছিল'। তিনি বলেন, আমি তাদের (সাথীদ্বয়কে) বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা?... তারা বলল, فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، 'সে এমন ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরজ ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে'।[১৪]

প্রতিদিন সকালে মুয়ায্যিনের সুমধুর আযান কিংবা অ্যালার্ম বাজার পরও আমরা যারা তা বন্ধ করে আবার আরামের ঘুমে আচ্ছন্ন হই, তারা যেন মূলত নিজেদের মাথাকে কবরের ঐ ভয়ংকর পাথরের আঘাতের জন্য স্বেচ্ছায় প্রস্তুত করছি। আল্লাহুল মুস্তা'আন! আমাদের কি একবারও ভয় হয় না যে, কাল সকালে আমাদের ঘুম ভাঙার আগেই যদি মৃত্যুর ফেরেশতা এসে হাযির হয়, তবে ঐ অন্ধকার কবরে আমাদের

১১. *তাফসীরে আবিস সু'ঊদ (ইরশাদুল 'আকলিস সালীম), ৯/১৪৬।*
১২. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৮/৩১৭।*
১৩. *তাফসীরে কাসেমী, মাহাসিনুত তা'বীল, ৯/৪০২।*
১৪. *ছহীহুল বুখারী হা/৭০৪৭।*

অবস্থা কেমন হবে?

বর্তমান সমাজে একটি ভয়ংকর প্রবণতা দেখা যায়। সেটা হ'ল- অনেকেই মনে করেন, 'সকালে উঠতে পারিনি তো কী হয়েছে! অফিসে যাওয়ার আগে ৮টা বা ৯টায় উঠে ছালাত পড়ে নেব'। এভাবে তারা প্রায় নিয়মিত সূর্য ওঠার পরে ফজর ছালাত আদায় করেন। নির্ধারিত সময় পার করে এভাবে ছালাত আদায় করা যে কত বড় অপরাধ, এ ব্যাপারে আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.) বলেন, 'কোন মুসলিমের জন্য ছালাতের একটি অংশও সময়ের আগে আদায় করা বৈধ নয়; আবার সময় অতিক্রম হওয়ার পর এর কোন অংশ বিলম্বিত করাও বৈধ নয়। সেই সব লোকের অবস্থা কতই না ভয়াবহ, যারা অলসতা, অবহেলা এবং আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে পুরো ছালাতই সময়ের পরে আদায় করে! তারা নিজেদের বিছানায় ঘুমের আরামে, খেল-তামাশায় ও উপার্জনে এমনভাবে মগ্ন থাকে, যেন তাদেরকে কেবল দুনিয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। মনে হয় তারা কুরআন পড়ে না; পড়লেও আল্লাহ্র এই বাণী তাদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে না, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন' *(মা'ঊন ১০৭/৪-৫)*।[১৫] মুফাসসিরগণ বলেন, 'ছালাত সম্পর্কে উদাসীনতা (السهو عن الصلاة) বলতে কি বোঝায়–এ বিষয়ে আলেমদের একাধিক মত রয়েছে। তার একটি হ'ল, এর অর্থ ছালাতকে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করা। অর্থাৎ ব্যক্তি এ বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেয় না যে, সে ছালাত আদায় করল কি-না, সময় হ'ল কি-না। সুযোগ হ'লে সময়মতো পড়ে, আর না হ'লে সময় চলে যাওয়ার পর পড়ে। এটাই হ'ল ছালাত সম্পর্কে উদাসীনতা। যেমন কোন কোন সালাফ বলেছেন, তারা ছালাত একেবারে পরিত্যাগ করেনি; বরং সময় পার করে বিলম্বে আদায় করত। তাই আল্লাহ তাদেরকে 'ওয়াইল' (ভয়াবহ শাস্তি)-এর হুমকি দিয়েছেন'।[১৬]

৬. ফজর ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ :

ফজরের ছালাত আদায়কারীর জন্য যেমন রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ ও আল্লাহ্র দীদার লাভের অফুরন্ত নে'মত, তেমনি এই ছালাত তরককারীর জন্যও রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের কঠোর হুঁশিয়ারি। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যারা আরামের ঘুমকে মহান আল্লাহ্র নির্দেশের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়, তাদের আখেরাতের পরিণতি বড়ই ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশী দয়াশীল ও স্নেহপরায়ণ। অথচ ফজর ও এশার জামা'আতে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকত, তাদের চরম অবহেলার কারণে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তাদের ঘরবাড়ি পর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো কঠিন ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুনাফিকের নিকট সবচেয়ে ভারী ছালাত হ'ল ফজর ও এশার ছালাত। অতঃপর তিনি বলেন, لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ، فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ، 'আমার ইচ্ছা হয় যে, মুয়ায্যিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি। আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নেই। অতঃপর যারা ছালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই'।[১৭]

একটি হারানো ফজরের বেদনা :

ইতিহাসের পাতায় এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যা আমাদের পাষাণ হৃদয়কে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। জলীলুল ক্বদর ছাহাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ) যখনই পারস্যের 'তুসতার' নগরী বিজয়ের কথা স্মরণ করতেন, তখনই তাঁর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরত। তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের অত্যন্ত সুরক্ষিত এক দুর্ভেদ্য নগরী ছিল এই তুসতার। দীর্ঘ অবরোধের পর মুসলিম বাহিনী এই নগরীর পতন ঘটাতে সক্ষম হন এবং মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। তুসতার অভিযান ছিল সে যুগের অন্যতম কঠিন ও ভয়ংকর অভিযান। স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি অভাবনীয় বিজয় মুসলমানদের জন্য সীমাহীন আনন্দ ও গৌরবের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল– এমন একটি মহাবিজয়ের কথা মনে পড়লেই আনাস (রাঃ) কাঁদতেন। কিন্তু কেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ফজরের ছালাতের নির্ধারিত সময়ের সামান্য পূর্বে তুসতার দুর্গ-দ্বার মুসলমানদের করতলগত হয়। মুসলিম বাহিনী স্রোতের ন্যায় দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর পারসিক বিশাল বাহিনীর সঙ্গে শুরু হয় এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কিন্তু মহান আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর অনুকূলেই বিজয়ের ইতিহাস রচিত হয়।

বিজয় অর্জিত হয় সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর। হঠাৎ করেই মুসলিম অভিযাত্রীগণ আবিষ্কার করলেন যে, এই ভয়াবহ যুদ্ধের ডামাডোলে তাদের সেদিনের ফজরের ছালাতের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে। লড়াইয়ের চরম সঙ্গিন মুহূর্তে উন্মুক্ত তরবারির নীচে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যুদ্ধ করার কারণে মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ সেদিনের ফজরের ছালাত সময়মতো আদায় করতে পারেননি; বরং সূর্য উদিত হওয়ার পর আদায় করেছিলেন।

শরী'আতের দৃষ্টিতে সেদিন তাঁরা সম্পূর্ণ অপারগ ও ক্ষমাযোগ্য ছিলেন। তাঁরা কোন দুনিয়াবী স্বার্থে বা ঘুমের ঘোরে ছালাত ছাড়েননি; বরং তাঁরা আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী

১৫. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আয-যিয়াউল লামি' মিনাল খুতাবিল জাওয়ামি' (রিয়াদ: আর-রিয়াসাহ আল-'আম্মাহ লি ইদারাতিল বুহূছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা' ওয়াদ-দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), ২/৩৯৮।

১৬. মুস্তফা আল-'আদাওয়ী, সিলসিলাতুত তাফসীর, ১০৪/৪।

১৭. বুখারী হা/ ৬৫৭; মুসলিম হা/ ৬৫১; আবুদাঊদ হা/৫৪৮।

করার জন্য ‘জিহাদ’-এ নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু যা ছুটে গেছে, তা যে অনেক মহান এক ইবাদত! আনাস (রাঃ) যখনই সেই দিনের কথা স্মরণ করতেন, একটি ফজর কাযা হওয়ার যন্ত্রণায় তাঁর বুক ফেটে কান্না আসত। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, شَهِدْتُ مُنَاهَضَةَ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ... وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاَةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ‘ভোরের আলো ফোটার সময় আমি তুসতার দুর্গ বিজয়ের ঐ কঠিন মুহূর্তে উপস্থিত ছিলাম... (ঐ ছুটে যাওয়া ফজর) ছালাতটি যথাসময়ে পড়ার বিনিময়ে আমাকে যদি গোটা দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সবকিছুও দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তা আমাকে আনন্দিত করবে না’।[১৮] আল্লাহু আকবার।

একবার নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখুন। আনাস (রাঃ) শারঈ ওযর থাকা সত্ত্বেও, জিহাদের ময়দানে থাকা অবস্থায় একটি মাত্র ফজর হারানোর বেদনায় আজীবন কেঁদেছেন। আর আমরা সামান্য ঘুমের মোহে, অলসতা করে বছরের পর বছর ফজর হারাচ্ছি, অথচ আমাদের চোখে এক ফোঁটা পানি নেই, হৃদয়ে সামান্যতম আক্ষেপ নেই! আমাদের ঈমানের পারদ আজ কোথায় নেমে গেছে, তা কি আমরা একটুও অনুভব করতে পারি না?

বিজ্ঞানের আলোকে ফজরে জাগার উপকারিতা

(১) সারকাডিয়ান রিদম এবং নোবেল বিজয়ীদের আবিষ্কার : আমাদের শরীরের ভেতরে একটি নিজস্ব ঘড়ি আছে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ‘সারকাডিয়ান রিদম’ (Circadian Rhythm) বা দেহঘড়ি বলা হয়। ২০১৭ সালে জেফরি হল, মাইকেল রোসব্যাশ এবং মাইকেল ইয়াং চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান এই ‘সারকাডিয়ান রিদম’-এর মেকানিজম আবিষ্কার করার জন্য। তাদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবদেহ প্রাকৃতিকভাবেই সূর্যোদয়ের আগে জেগে ওঠে এবং সূর্যাস্তের পর ঘুমিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যারা এই প্রাকৃতিক ঘড়ির সাথে তাল মিলিয়ে ভোরে জাগ্রত হয়, তাদের হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের ঝুঁকি বহুগুণ কমে যায়।[১৯]

(২) ভোরের বিশুদ্ধ অক্সিজেন :

ভোরবেলা বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা সবচেয়ে বেশী থাকে এবং এই সময় বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিমাণ ওজোন (O3) গ্যাসের উপস্থিতি থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, ভোরের এই নির্মল হাওয়া যখন আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে, তখন তা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে সতেজ করে তোলে, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং শরীরের কোষগুলোতে এক নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করে। ফজর ছালাতে হেঁটে যাওয়ার সময় যে বিশুদ্ধ বায়ু আমরা গ্রহণ করি, তা সারাদিনের জন্য আমাদের সতেজ রাখার সেরা টনিক হিসাবে কাজ করে।

(৩) কর্টিসল ও মেলাটোনিন হরমোনের ভারসাম্য :

কর্টিসল (Cortisol) এবং মেলাটোনিন (Melatonin) এ দু’টি মানবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। প্রথমটি জাগ্রত হওয়া, শক্তি ও চাপ মোকাবিলা নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যটি ঘুম ও দেহঘড়ি (biological clock) নিয়ন্ত্রণ করে। জার্মানের একদল বিজ্ঞানীর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার ঠিক সাথে সাথে (প্রথম ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে) মানবদেহে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা চরমভাবে বৃদ্ধি পায় (প্রায় ৫০% থেকে ১৬০% পর্যন্ত)। এই প্রক্রিয়াটিকেই বিজ্ঞানের ভাষায় ‘Cortisol Awakening Response’ (CAR) বলা হয়। এটি মূলত মানুষের মস্তিষ্ক ও শরীরকে সারাদিনের কর্মব্যস্ততার জন্য ‘সুইচ অন’ বা প্রস্তুত করে। গবেষণায় আরও দেখা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে গিয়ে যারা দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে বা যাদের ঘুমের রুটিন এলোমেলো, তাদের এই CAR সাইকেল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তাদের শরীরে সারাদিন এনার্জির ঘাটতি, অবসাদ, দুশ্চিন্তা এবং মানসিক চাপের পরিমাণ বেশী থাকে।[২০]

(৪) বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি :

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (AMA) বিখ্যাত জার্নাল ‘জামা সাইকিয়াট্রি’-তে প্রকাশিত ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো বোল্ডার এবং হার্ভার্ডের গবেষকদের প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাযার মানুষের ওপর করা এক বিশাল গবেষণায় দেখা গেছে, যারা রাতে আগে ঘুমান এবং ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন, তাদের মাঝে মেজর ডিপ্রেশন বা চরম বিষণ্ণতার ঝুঁকি দেরিতে ঘুমানো মানুষদের তুলনায় ২৩% থেকে ৪০% পর্যন্ত কম থাকে। এছাড়া অন্যান্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় এ কথাও প্রমাণিত যে, ভোরে জাগা মানুষদের মাঝে উদ্বেগ (Anxiety) এবং সিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক ব্যাধির ঝুঁকিও অনেক কম থাকে।[২১]

(৫) যিকির ও ব্রেইন ওয়েভ (Brain Waves) :

ফজরের ছালাতের পর যখন বান্দা শান্ত পরিবেশে মসজিদে বা মুছাল্লায় (জায়নামাযে) বসে আল্লাহ্র যিকির করেন, কুরআন তেলাওয়াত করেন, তখন তার মস্তিষ্কে ‘আলফা ব্রেইন ওয়েভ’ উৎপন্ন হয়। সাইকোলজিস্টদের মতে, এই আলফা ওয়েভ মানুষকে চরম মানসিক প্রশান্তি দেয়, স্ট্রেস হরমোন কমায় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা (Cognitive Function) বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়।

---

১৮. *ছহীহুল বুখারী, ৯৪৫নং হাদীছের তালীক্ব দ্রষ্টব্য; কিতাবুল খাউফ, অধ্যায়-১২, অনুচ্ছেদ-৪; ৪/৮৩। তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/৪৯৮।*

১৯. *www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/press-release*

২০. *Eva Fries, Lucia Dettenborn, and Clemens Kirschbaum, “The Cortisol Awakening Response (CAR): Facts and Future Directions,” International Journal of Psychophysiology 72, no. 1 (2009): 67–73, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18854200.*

২১. *Iyad F. Daghlas, Jacqueline M. Lane, Richa Saxena, and Celine Vetter, "Genetically Proxied Diurnal Preference, Sleep Timing, and Risk of Major Depressive Disorder," JAMA Psychiatry 78, no. 8 (2021): 903–10. https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2780428*

(৬) ক্যারিয়ার, ব্যবসা ও কর্মজীবনে ফজরের প্রভাব :

বিশ্ববিখ্যাত লিডারশিপ এক্সপার্ট রবিন শর্মা তার বেস্টসেলার বই The 5 AM Club-এ দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ব্যক্তিরা, সেরা ব্যবসায়ীরা এবং সৃষ্টিশীল মানুষেরা ভোর ৫টায় ঘুম থেকে ওঠেন। কেন? কারণ ভোরের এই সময়টিতে মানুষের মন সবচেয়ে বেশী ফোকাসড বা তীক্ষ্ম মনোযোগী থাকে। কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর ও বিখ্যাত গবেষক ক্যাল নিউপোর্ট তার বিশ্ব নন্দিত 'ডিপ ওয়ার্ক' বইয়ে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক যুগে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা সময়ের অভাব নয়; বরং মনোযোগের অভাব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, নোটিফিকেশন, ই-মেইল, ফোনকল ও অনবরত ব্যস্ততা মানুষের গভীর চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করছে। তাই তিনি এমন একটি কাজের পদ্ধতির কথা বলেন, যেখানে মানুষ নিরবচ্ছিন্নভাবে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়। তিনি এটিকেই Deep Work নাম দিয়েছেন। আর এই 'ডিপ ওয়ার্ক'-এর সবচেয়ে উপযোগী সময় হ'ল ফজরের সময়।

আধুনিক টাইম ম্যানেজমেন্টের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বেস্টসেলার বই হ'ল Hal Elrod-এর লেখা The Miracle Morning। এই গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন যে, প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট কিছু অভ্যাস (যাকে তিনি S.A.V.E.R.S : Silence, Affirmations, Visualization, Exercise, Reading, Scribing বলেছেন) পালনের মাধ্যমে মানুষের প্রোডাক্টিভিটি, মানসিক ফোকাস এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট জাদুকরীভাবে বৃদ্ধি পায়। যারা দিনের প্রথম ভাগকে সচেতনভাবে কাজে লাগায়, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে।

Hal Elrod হয়ত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বইটি লেখেননি, তবে তিনি ভোরের যে জাদুকরী ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন, তার শেকড় প্রোথিত রয়েছে ইসলামী জীবনব্যবস্থার গভীরে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে ইসলাম শুধু ভোরের প্রোডাক্টিভিটির কথাই বলেনি, বরং এর সঙ্গে যুক্ত করেছে 'বরকত' বা ইলাহী প্রাচুর্যের এক সুমহান প্রতিশ্রুতি। ছাখর আল-গামেদী (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا 'হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের বরকত দান করুন'। রাবী বলেন, وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، 'তিনি কোন ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলে দিনের ভোরেই পাঠাতেন'। বর্ণনাকারী ছাখর (রাঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার পণ্যদ্রব্য দিনের প্রথমভাগে (ভোরে) পাঠাতেন, ফলে তিনি সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং এভাবে তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন'।[২২] অত্র হাদীছের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের তিনটি চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায় :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ ও বরকতের নিশ্চয়তা:

আধুনিক বিজ্ঞান ভোরের যে Peak Productivity বা সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতার কথা বলে, ইসলাম তাকে সংজ্ঞায়িত করেছে 'বরকত' দিয়ে। বরকত মানে কেবল সংখ্যায় বৃদ্ধি নয়; বরকত হ'ল অল্প সময়ে বেশী কাজ হওয়া, উপার্জনে তৃপ্তি থাকা এবং চেষ্টার তুলনায় বেশী ফলাফল লাভ করা। একজন মুসলিম যখন ফজর পড়ে দিনের কাজ শুরু করেন, তখন তিনি শুধু নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়েই কাজ করেন না, বরং তার সাথে যুক্ত হয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বরকতের দো'আ।

(খ) ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি:

উপরোক্ত হাদীছে ছাখর (রাঃ)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তব প্রমাণ। তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তিনি তার ব্যবসার চালান বা পণ্য ভোর বেলা পাঠাতেন। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তার ব্যবসায় এত বরকত দিয়েছিলেন যে, তিনি বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। আধুনিক কর্পোরেট দুনিয়া আজ বিলিয়নিয়ারদের 5 AM Club নিয়ে গবেষণা করছে, অথচ আমাদের সালাফগণ ভোরের বরকত কাজে লাগিয়ে সেই সফলতার চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন বহু শতাব্দী আগে।

(গ) সামরিক ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফজরের প্রভাব :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সামরিক বাহিনী বা কোন প্রতিনিধি দল পাঠালে ভোরে পাঠাতেন। কারণ সকালে মানসিক স্বচ্ছতা ও শারীরিক শক্তি থাকে তুঙ্গে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান যাকে ডিসিশন ফ্যাটিগ বা দিন বাড়ার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্লান্তি বলে, ভোরের এই সময়টিতে তা থাকে শূন্যের কোঠায়। ফলে যে কোন জটিল ও কৌশলগত কাজে ভোরের সময়টা সর্বাধিক কার্যকর।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উপরে বর্ণিত গবেষণাগুলো ফজরের ছালাত বা যিকিরকে সরাসরি পরীক্ষা করেনি। এটি মূলত দেখিয়েছে যে, ভোরে জাগার অভ্যাস মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। একজন মুসলিমের জন্য ফজরে জাগার সর্বপ্রথম ও প্রধান কারণ হ'ল আল্লাহ্‌র আদেশ পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো কেবল এ ইবাদতের কিছু জাগতিক উপকারিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরে; এগুলো ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ফজরের ছালাত, সকালবেলার যিকির এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে একজন মুমিন একদিকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করেন, অন্যদিকে এমন একটি জীবনধারা অনুসরণ করেন, যা আধুনিক গবেষণার আলোকে মানসিক সুস্থতা ও কর্মক্ষমতার জন্যও সহায়ক হ'তে পারে।

২২. *আবুদাউদ হা/২৬০৬; তিরমিযী হা/১২১২; মিশকাত হা/৩৯০৮; হাদীছ ছহীহ।*

ফজরের গাফিলতি থেকে বাঁচার উপায়

ফজরের ছালাত নিয়মিত আদায় করতে পারাটা আল্লাহ্র এক বিশেষ তাওফীক্ব। তবে এই তাওফীক্ব লাভের জন্য বান্দার পক্ষ থেকে কিছু সদিচ্ছা ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত যরূরী। নিম্নে ফজরের গাফিলতি থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়গুলো সংক্ষেপে পেশ করা হ'ল-

১. রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পরে দুনিয়াবী কথাবার্তা বা গল্পগুজব করাকে অপসন্দ করতেন।[২৩] তিনি এশার পরপরই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার তাকীদ দিয়েছেন, যাতে শেষ রাতে বা ভোরে ওঠা সহজ হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের শরীরের Circadian Rhythm বা দেহঘড়ি অনুযায়ী রাত ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ঘুম সবচেয়ে বেশী গভীর ও উপকারী। এ সময় মেলাটোনিন (Melatonin) হরমোনের নিঃসরণ সর্বোচ্চ থাকে। দেরিতে ঘুমালে এই সাইকেল নষ্ট হয়, ফলে সকালে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল লাগে।

২. ঘুমানোর আদব বা সুন্নাতগুলো রক্ষা করা:

ঘুম একটি ইবাদত হ'তে পারে যদি তা সুন্নাতী পদ্ধতিতে হয়। ওযূ করে ঘুমাতে যাওয়া, ডান কাতে শোয়া,[২৪] আয়াতুল কুরসী পড়া,[২৫] তিন কুল (সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস) পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে শরীর মাসাহ করা (৩ বার) এবং ঘুমের দো'আ পড়ার মাধ্যমে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।[২৬] যখন বান্দা পবিত্র হয়ে ঘুমাতে যায়, একজন ফেরেশতা সারারাত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং দো'আ করতে থাকেন।[২৭] ফলে তিনি খুব সহজেই ফজরে উঠতে পারেন। আধুনিক সাইকোলজি একে 'স্লিপ হাইজিন' (Sleep Hygiene) বলে। ঘুমানোর আগে নির্দিষ্ট কিছু ইতিবাচক কাজ মস্কিষ্ককে সংকেত দেয় যে, এখন বিশ্রামের সময়। এটি দ্রুত ঘুম আনতে এবং ঘুমের মান বাড়াতে সাহায্য করে।

৩. রাতে হালকা খাবার খাওয়া :

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ইসলামী আদব উভয়ের মতেই রাতের খাবার হালকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। পেট ভরে ভারী খাবার খেলে শরীরে অলসতা ও তন্দ্রা চেপে বসে, যার ফলে ঘুম অত্যন্ত গাঢ় হয় এবং ফজরের সময় জেগে ওঠা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই রাতে পরিমিত ও সহজপাচ্য খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কেননা রাতে ভারী বা অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার খেলে পাকস্থলী তা হজম করতে শরীরের প্রচুর এনার্জি খরচ করে। ফলে ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিশ্রাম পায় না। সকালে ঘুম ভাঙলেও এক ধরনের আড়ষ্টতা কাজ করে। আর রাতে হালকা খাবার খেলে ভোরে শরীর অনেক সতেজ, ও ফুরফুরে থাকে।

৪. পাপাচার থেকে দূরে থাকা :

দিনের বেলার পাপাচার রাতের ইবাদত থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। তাওফীক্ব লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। এক ব্যক্তি প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আবু সাঈদ! আমি সুস্থ অবস্থায় ঘুমাতে যাই, ফজর ও তাহাজ্জুদের জন্য পানিও প্রস্তুত রাখি, তবুও আমি ছালাতের জন্য সময়মতো উঠতে পারি না কেন? তিনি বললেন, قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ 'তোমার পাপসমূহ তোমাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে (যার কারণে তুমি উঠতে পারো না)'।[২৮] অর্থাৎ দিনের বেলা আমরা চোখ, কান ও জিহ্বা দিয়ে যেসব গোনাহ করি, সেগুলোই মূলত আমাদের রবের সামনে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে। মনোবিজ্ঞান বলে, অপরাধবোধ ও নেতিবাচক কাজ মানুষের অবচেতন মনে এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও মানসিক চাপ তৈরি করে। এই চাপ মানুষের ইচ্ছাশক্তি (Willpower) কমিয়ে দেয়, ফলে ভালো কাজের প্রতি তার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

৫. ঘুমানোর আগে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস থেকে দূরে থাকা :

বর্তমান সময়ে ফজর ছুটে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল স্মার্টফোন। ঘুমানোর আগে দীর্ঘসময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন নামক ঘুমের হরমোন নিঃসরণ বাধাগ্রস্ত হয়। মস্তিষ্ক ভাবে এখনো দিন রয়ে গেছে। ফলে গভীর ঘুম আসে না এবং সকালে শরীর মারাত্মক ক্লান্ত থাকে। তাই ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা টেলিভিশন থেকে দূরে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

৬. একাধিক এলার্ম দিয়ে রাখা :

আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের পাশাপাশি ফজরের সময় জাগার জন্য এলার্ম দিয়ে রাখা যায়। সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হ'ল, ফোন বা এলার্ম ঘড়িটি বিছানা থেকে একটু দূরে রাখা। যাতে এলার্ম বন্ধ করার জন্য বিছানা থেকে উঠে কয়েক পা হাঁটতে হয়। কারণ ঘুমের পর একটু হাঁটাহাঁটি করলেই মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায় এবং ঘুমের ঘোর কেটে যায়। আর একবার বিছানা ছেড়ে উঠে গেলে অলসতার ভাবও দূরীভুত হয়।

৭. পরিবারের একে অপরকে সহযোগিতা করা :

ফজরের জাগরণকে পারিবারিক একটি অভ্যাসে পরিণত করা বাঞ্ছনীয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে জাগিয়ে তুলবেন। যারা এ কাজ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রহমতের দো'আ

---

২৩. বুখারী হা/৫৪৭; আবুদাঊদ হা/৩৯৮; মিশকাত হা/৫৮৭।
২৪. বুখারী হা/২৪৭; মুসলিম হা/২৭১০।
২৫. বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩।
২৬. বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২১৩২।
২৭. ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা/১০৫১; ছহীহাহ হা/২৫৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/৫৯৭; সনদ হাসান লিগায়রিহী।
২৮. ইবনু আব্দি রব্বিহী আল-আন্দালুসী, আল-ইক্বদুল ফারীদ (মৃ.৩২৮হি.) (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি.), ৩/১৩৫।

করেছেন।[২৯] পিতা-মাতা সন্তানদের ফজর পড়ার তাকীদ দেবেন। পরিবারের সবাই মিলে একে অপরের জান্নাতের সহযোগী হয়ে এই বরকতময় আমলটি ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। সাইকোলজির পরিভাষায় একে 'সোশ্যাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি' বা সামাজিক দায়বদ্ধতা বলা হয়। একা কোন ভালো অভ্যাস গড়ার চেয়ে পরিবারের বা রুমমেটদের সাথে মিলে একটি 'সাপোর্ট সিস্টেম' তৈরি করলে সফলতার হার বহুগুণ বেড়ে যায়।

৮. ফজরের ছালাতের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া :

সবকিছুর মূলে রয়েছে মযবূত ঈমানী সংকল্প ও তাওয়াক্কুল। রাতে ঘুমানোর সময় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে মনকে এই নির্দেশ দিয়ে ঘুমাতে হবে যে, 'আমি অবশ্যই সময়মত বা জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করব ইনশাআল্লাহ'। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'কগনিটিভ প্রাইমিং'। ঘুমানোর আগে ব্রেনকে যদি কোন একটি বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে অবচেতন মন (Subconscious mind) ঐ নির্দিষ্ট সময়ে মস্তিষ্ককে ঠিকই জাগিয়ে তোলে। সুতরাং মনের ভেতর যদি একনিষ্ঠ সংকল্প ও আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনার তীব্রতা থাকে, তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সঠিক সময়ে জাগিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার :

ফজর ছালাত হ'ল আমাদের ঈমানের সবচেয়ে বড় থার্মোমিটার। প্রতিদিন শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের প্রথম হাতিয়ার। সুতরাং ফজরের ছালাতের সময় একজন প্রকৃত মুসলিম কখনোই ঘুমে বিভোর থাকতে পারে না। আমরা যদি সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে, অফিসে বসের ডাকে, পরীক্ষার জন্য কিংবা বিমানের ফ্লাইট ধরার জন্য রাতের ঘুম অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারি, তবে মহামহিম আল্লাহ্র ডাকে কেন আমরা সাড়া দিতে পারব না? তাই আসুন! অতীতের সমস্ত ভুলের জন্য আল্লাহ্র কাছে একনিষ্ঠ মনে তওবা করি এবং আজই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই। সব ধরনের অলসতা, রাতের অনর্থক জাগরণ ও শয়তানের ধোঁকাকে পদদলিত করে জীবনের রুটিনকে নতুন করে সাজাই। ফজরের পবিত্র বাতাসে বিশুদ্ধ শ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র সামনে সিজদাবনত হয়ে দিনটি শুরু করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রতিদিন জামা'আতের সাথে ফজর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে তাঁর যিম্মাদারী, দুনিয়াবী বরকত ও আখেরাতের চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের তাওফীক্ব দান করুন এবং গাফলতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

---

২৯. আবূদাঊদ হা/১৪১৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬; সনদ হাসান।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : সেপ্টেম্বর ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	১৮ রবীঃ আউঃ	১৭ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:১৮	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	২০ রবীঃ আউঃ	১৯ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৫	০৭:৩২
০৫ সেপ্টেম্বর	২২ রবীঃ আউঃ	২১ ভাদ	শনিবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:৩০
০৭ সেপ্টেম্বর	২৪ রবীঃ আউঃ	২৩ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৭	০৫:৪২	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	২৬ রবীঃ আউঃ	২৫ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:০৯	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	২৮ রবীঃ আউঃ	২৭ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৭	০৭:২৩
১৩ সেপ্টেম্বর	৩০ রবীঃ আউঃ	২৯ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৫	০৭:২১
১৫ সেপ্টেম্বর	০২ রবীঃ আখের	৩১ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:৩০	০৫:৪৫	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:১৮
১৭ সেপ্টেম্বর	০৪ রবীঃ আখের	০২ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০১	০৭:১৬
১৯ সেপ্টেম্বর	০৬ রবীঃ আখের	০৪ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩১	০৫:৪৭	১১:৫৩	০৩:১৯	০৫:৫৮	০৭:১৪
২১ সেপ্টেম্বর	০৮ রবীঃ আখের	০৬ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩২	০৫:৪৮	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৬	০৭:১২
২৩ সেপ্টেম্বর	১০ রবীঃ আখের	০৮ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৩	০৫:৪৮	১১:৫১	০৩:১৭	০৫:৫৫	০৭:১০
২৫ সেপ্টেম্বর	১২ রবীঃ আখের	১০ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৪	০৫:৪৮	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৩	০৭:০৮
২৭ সেপ্টেম্বর	১৪ রবীঃ আখের	১২ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৪	০৫:৪৯	১১:৫০	০৩:১৫	০৫:৫০	০৭:০৭
২৯ সেপ্টেম্বর	১৬ রবীঃ আখের	১৪ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৯	০৩:১৪	০৫:৪৮	০৭:০৩

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-২	-১	-১	-১	-১
গাযীপুর	+১	+১	০	০	+১
শরীয়তপুর	+১	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	-১	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-১	-২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১	-১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৪	+৪
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	০	+১	+২	+২	+৩
ময়মনসিংহ	-১	০	+১	০	+১
জামালপুর	+১	+২	+৩	+২	+৪
নেত্রকোণা	-২	-১	০	-১	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৪	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৪	+৫	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৩	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৭
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৬
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৩	+৩	+২	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+২	+১	০	০	০
পটুয়াখালী	+১	০	-১	০	০
পিরোজপুর	+২	+২	+১	+১	+১
বরিশাল	+১	০	০	০	০
ভোলা	-১	-১	-২	-১	-২
বরগুনা	+২	+১	০	০	০

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৫	+৪	+৬
রাজশাহী	+৭	+৭	+৮	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৫	+৬	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯	+৯	+১০
নওগা	+৫	+৭	+৭	+৬	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৫	+৮	+৯	+৮	+১০
দিনাজপুর	+৫	+৭	+৮	+৭	+৯
লালমণিরহাট	+২	+৫	+৬	+৪	+৭
নীলফামারী	+৪	+৬	+৮	+৭	+৯
গাইবান্ধা	+২	+৪	+৫	+৪	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৮	+১০	+৮	+১১
রংপুর	+৩	+৫	+৬	+৫	+৭
কুড়িগ্রাম	+১	+৩	+৪	+৩	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৩	-৪	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩	-২
রাঙ্গামাটি	-৬	-৭	-৮	-৮	-৮
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩	-৩	-৩
চাঁদপুর	-১	-২	-২	-২	-২
লক্ষ্মীপুর	-১	-২	-২	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৫	-৬	-৭	-৬	-৬
কক্সবাজার	-৪	-৬	-৮	-৭	-৮
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৬	-৭	-৬
বান্দরবান	-৬	-৮	-৯	-৮	-৯

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৭	-৬	-৫	-৬	-৪
মৌলভীবাযার	-৬	-৬	-৫	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৪	-৪	-৩
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৩	-৪	-৩

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

জবাবদিহিতা : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের অন্যতম ভিত্তি

*-মামূন বিন হাশমত**

ভূমিকা :

পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে বহু শক্তিশালী সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছে কেবল একটি মাত্র বিষয়ের অভাবে, আর তা হ'ল 'জবাবদিহিতা'। প্রাচীনকালের গোত্রভিত্তিক শাসন কাঠামো থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, যখনই শাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জবাবদিহিতার অভাব দেখা দিয়েছে, ঠিক তখনই সেখানে দুর্নীতি, অধিকার হরণ ও সামাজিক অবক্ষয় ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। একটি সুন্দর ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মূলভিত্তি কেবল কঠোর আইন প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রতিটি ব্যক্তির ভেতরের নৈতিকতার ওপর।

ইসলাম এই জবাবদিহিতাকে কেবল জাগতিক বা আইনী কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি, বরং একে আত্মিক ও পরকালীন বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করে এক অনন্য রূপ দিয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রের কোন নযরদারী নেই, যেখানে দুর্নীতির সুযোগ শতভাগ, সেখানেও একজন মানুষ কেন স্বেচ্ছায় অন্যায় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবে? এর উত্তর লুকিয়ে আছে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার চেতনায়। আলোচ্য জবাবদিহিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

জবাবদিহিতার পরিচয় :

'জবাবদিহিতা' একটি বাংলা শব্দ, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Accountability বা Responsibility। আরবী ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে المسؤولية (আল-মাসউলিয়্যাহ), যা سأل (সাআলা) ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা, কৈফিয়ত চাওয়া বা কোন কাজের জন্য দায়ী করা। সুতরাং শাব্দিক অর্থে জবাবদিহিতা বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে একজন ব্যক্তি তার কাজ, সিদ্ধান্ত ও আচরণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকে।

পরিভাষায় দায়বদ্ধতা হ'ল এমন এক অবস্থা, যার কারণে মানুষ তার সম্পাদিত কাজ বা কার্যকলাপ সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয় এবং এর ভালো-মন্দ পরিণতির দায়ভার তার ওপরই বর্তায়।[১]

সারকথা হ'ল নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আমানতদারিতার সাথে পালন করা এবং এর ফলাফলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ও সমাজের কাছে জবাব দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি রাখাই হ'ল জবাবদিহিতা।

** লাউবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*

১. আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল-আ'লাম (দারুল মাশরিক, বৈরূত) পৃ. ৩১৬।

নযরদারী ও জবাবদিহিতা :

ইসলামে জবাবদিহিতার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ভিত্তি হ'ল এই বিশ্বাস যে, মানুষের প্রতিটি কাজ, কথা এবং আচরণ সার্বক্ষণিকভাবে ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে কোন অপরাধ করা সম্ভব হ'লেও আল্লাহ্‌র নযরদারী এড়ানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ-كِرَامًا كَاتِبِينَ-يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، 'অথচ তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানেন যা তোমরা কর' *(ইনফিতার ৮২/১০-১২)*। তিনি আরো বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا-اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৩-১৪)*। এই নযরদারী ও জবাবদিহিতার অনুভূতি একজন মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে যেকোন অবস্থায় অন্যায়, দুর্নীতি বা অন্যের অধিকার হরণ থেকে বিরত রাখে।

ইসলামে জবাবদিহিতার গুরুত্ব ও স্বরূপ

প্রতিটি মানুষকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর দেওয়া বিধান পালনই হ'ল মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। দুনিয়ার বুকে মানুষের প্রতিটি কথা, কাজ ও আচরণ নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ক্বিয়ামতের দিন সেই সংরক্ষিত আমলনামা উন্মুক্ত করে প্রতিটি মানুষকে তার নিজ নিজ কাজের চূড়ান্ত হিসাব দিতে বলা হবে। পরকালীন এই জবাবদিহিতার শাশ্বত ভিত্তি মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্র কোথায় কিভাবে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে, তার প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হ'ল।

১. আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সম্পর্কে জবাবদিহিতা :

আল্লাহ অগণিত নে'মত ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা শেষ করতে পারবো না। কিন্তু তাঁর দেওয়া প্রতিটি নে'মত সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا، 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সমূহ গণনা কর, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/১৮)*। তিনি আরো বলেন, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، 'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং একটি সমুদ্রের সাথে সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর নে'মতসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা

পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(লোকমান ৩১/২৭)*।

মূলত আমাদের পুরো জীবনটাই আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্র নে'মত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত (সম্পদ) মনে কর। ১. বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে ২. পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে ৩. দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে'।[২]

সুস্থ শরীর, মহামূল্যবান সময়, মেধা ও জ্ঞান, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সামাজিক মর্যাদা কিংবা ক্ষমতা এর কোনটিই আমাদের একান্ত নিজস্ব অর্জন নয়। এগুলো মহান রবের দেওয়া এক পবিত্র আমানত। ক্বিয়ামতের দিন এই আমানতের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে চূড়ান্ত জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 'অতঃপর সেদিন তোমাদেরকে অবশ্যই (প্রত্যেক) নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' *(তাকাছুর ১০২/৮)*।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে :

দায়িত্ব পালন ও আমানত রক্ষার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ যথাযথভাবে তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*। নিজ নিজ দায়িত্বের জবাবদিহিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... 'সাবধান তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এমনকি দাস-দাসীও তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সেইদিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'।[৩]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে প্রতিটি দায়িত্বই একটি আমানত এবং প্রতিটি আমানতের সঙ্গেই জবাবদিহিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে পরিবারের কর্তা, স্ত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী কিংবা সমাজের যেকোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে।

জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জবাবদিহিতা :

ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদের কাছে তাদের এই চরম পরিণতির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। সেদিন জাহান্নামীরা নিজেদের মুখেই দুনিয়ায় তাদের গাফিলতি, দায়িত্বহীনতা ও আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করার কথা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ- إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ- فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ- عَنِ الْمُجْرِمِينَ- مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ- وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ- حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ। তবে ডানদিকের লোকেরা ছাড়া। তারা জান্নাতে অবস্থান করে অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, 'কিসে তোমাদেরকে সাক্বারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করাল? তারা (জাহান্নামীরা) বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় লিপ্ত থাকতাম। আমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলতাম। অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হ'ল' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮-৪৭)*।

অতএব একজন মুমিনের একান্ত কর্তব্য হ'ল ইবাদত, মানবসেবা এবং আখেরাতের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবনযাপন করা, যাতে ক্বিয়ামতের দিন সে সফলভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করে মুক্তি লাভ করতে পারে।

সন্তান হত্যা ও সন্তান সম্পর্কে জবাবদিহিতা :

সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক মহামূল্যবান আমানত। পিতা-মাতার ওপর সন্তানের জীবন, লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। জাহেলী যুগে দারিদ্র্যের ভয়ে কিংবা সামাজিক কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নির্মম প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম এই বর্বরোচিত প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছে। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করে পরকালে এ বিষয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাশিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল' *(তাকভীর ৮১/৮-৯)*। এখানে নিরপরাধ মযলূম মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করার অর্থ হ'ল যালেম পিতামাতাকে তার সামনে ধিক্কার দেওয়া। অথবা হত্যাকারীকে মেয়েটির সামনে ডেকে এনে ধমক দিয়ে

---

২. হাকেম হা/৭৮৪৬; ছহীহাহ হা/১১৫৭; মিশকাত হা/৫১৭৪।
৩. বুখারী হা/৭১৩৮; মিশকাত হা/৩৬৫।

বলা হবে, তুমি বল, কেন মেয়েটি নিহত হ'ল? *(ক্বাসেমী)*। অনেকেই আছেন দরিদ্রতার ভয়ে ভ্রূণ হত্যা করেন। কন্যা সন্তান মানুষ করা ও তাকে বড় করে বিয়ে দেওয়াকে বোঝা মনে করেও একাজ করে থাকেন। মহান আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানের রিযিকের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিযিক দান করি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক মহাপাপ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩১)*।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের শুধু শারীরিক নিরাপত্তাই নয়; বরং তাদের যথাযথ অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের সাথে সুন্দর ও গঠনমূলক আচরণের মাধ্যমে বড় করে তোলা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা :

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ তার নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না এবং অন্যের অপরাধের কারণে শাস্তিও ভোগ করবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের আমল সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। একের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তার নিজের কর্মের জন্যই জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষের জীবন, যৌবন, ধন-সম্পদ, জ্ঞান ও কর্ম এসব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমানত। ক্বিয়ামতের দিন এসব আমানতের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ হাশরের ময়দানে আদম সন্তানকে তার পুরো জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি প্রশ্ন করবেন। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পা তার রবের নিকট হ'তে নড়বে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে। তার যৌবনকাল সম্পর্কে, তা কিভাবে শেষ করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথা হ'তে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে। আর সে যে জ্ঞান অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না'।[৪]

একজন মুমিনের জীবনের কোন মুহূর্তই হিসাবের বাইরে নয়। বিশেষ করে যৌবনের শক্তি, উপার্জনের হালাল-হারাম মাপকাঠি এবং অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের বিষয়ে আল্লাহ্র দরবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। তাই ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার এই ভয়কে অন্তরে ধারণ করে প্রতিটি মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করা।

রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃত্বের জবাবদিহিতা :

ইসলামে নেতৃত্ব একটি মহান আমানত। রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক, প্রশাসক কিংবা যে কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার অধীনস্থ জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার এবং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করার নির্দেশ দেন। আর অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' *(নাহল ১৬/৯০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন দায়িত্ব লাভ করল, অতঃপর সে তাদের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন'।[৫]

সরকারী সম্পদ ও আমানতের জবাবদিহিতা :

ইসলামে সরকারী সম্পদ, বায়তুলমালের অর্থ এবং জনগণের আমানত অত্যন্ত পবিত্র। কোন ব্যক্তি যদি সরকারী দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অবৈধভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করে বা উপঢৌকনের নামে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করে, তবে তা খিয়ানত হিসাবে গণ্য হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খিয়ানত করো না *(আনফাল ৮/২৭)*। অন্যত্র তিনি খিয়ানতকারীদের পরিণাম সম্পর্কে বলেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'কোন নবীর পক্ষে খিয়ানত করা সম্ভব নয়। আর যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে যা খিয়ানত করেছে তা বহন করে উপস্থিত হবে *(আলে-ইমরান ৩/১৬১)*।

সরকারী দায়িত্বে থেকে উপহার বা উপঢৌকন নেওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আবু হুমাইদ

৪. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৯৪৬।

৫. মুসলিম হা/১৪২।

সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) আযদ গোত্রের ইবনু লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে ছাদাক্বাহ (যাকাত) সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সে তার পিতা কিংবা তার মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না? তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! ছাদাক্বার মাল হ'তে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে ক্বিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হ'লে তার আওয়াজ করবে, গাভী হ'লে হাম্বা হাম্বা রব করবে আর বকরি হ'লে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু'হাত এমনভাবে উঠালেন যে, আমরা তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি'?[৬]

সরকারী সম্পদ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং জনগণের আমানতের প্রতি খিয়ানত ইসলামে গুরুতর অপরাধ। ক্ষমতার ব্যবহার করে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ, ঘুষ, আত্মসাৎ কিংবা উপহারের নামে ব্যক্তিগত লাভ অর্জন এসবই খিয়ানত। তাই একজন দায়িত্বশীল মুসলিমের কর্তব্য হ'ল সরকারী ও জনসাধারণের সম্পদকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গণ্য করা এবং সর্বোচ্চ সততা ও স্বচ্ছতার সাথে তা পরিচালনা করা। যাতে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে সফলভাবে জবাবদিহি করা যায়।

বান্দার হক লঙ্ঘনের জবাবদিহিতা :

ইসলামে মহান আল্লাহ্র হকের (হাক্কুল্লাহ) পাশাপাশি বান্দার হক বা মানবাধিকার (হাক্কুল ইবাদ) সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ বা যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদত পালনের পরও যদি কোন ব্যক্তি মানুষের ওপর যুলুম করে, তাদের অধিকার হরণ করে কিংবা কারও সম্মান ও সম্পদের ক্ষতিসাধন করে তবে তাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হ'তে হবে। বান্দার হক নষ্টকারীকে কেবল তার নফল বা ফরয ইবাদত জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না; বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে' *(ইউনুস ১০/৪৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، 'যালিমরা যা করে, তুমি কখনো মনে করো না যে আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন' *(ইবরাহীম ১৪/৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কি জানো নিঃস্ব (মুফলিস) কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সে-ই, যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের প্রকৃত নিঃস্ব হ'ল সেই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও ওপর অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারও রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং কাউকে প্রহার করেছে (তারাও উপস্থিত হবে)। ফলে তার নেক আমলগুলো মযলূমদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যদি পাওনাদারদের হক আদায়ের পূর্বেই তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের গুনাহ থেকে যুলম পরিমাণ গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৭]

সুতরাং শুধুমাত্র ইবাদত-বন্দেগী একজন মুমিনের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সমাজের প্রতিটি মানুষের সম্মান, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তার মৌলিক দায়িত্ব। তাই প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য হ'ল আল্লাহ্র হকের পাশাপাশি বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করা এবং সব ধরনের যুলুম ও অবিচার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা।

রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، 'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন' *(মায়েদা ৫/৬৭)*। উক্ত আয়াতটি ইসলামী দৃষ্টিতে জবাবদিহিতার একটি মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। এতে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, রিসালাত বা আল্লাহ্র বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া একটি অপরিহার্য দায়িত্ব, যার ব্যত্যয় ঘটলে দায়িত্ব পালন হয় না। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরও এই দায়িত্ব সর্বোচ্চ গুরুত্বসহ আরোপ করা হয়েছে।

উক্ত নির্দেশনার বাস্তব প্রতিফলন পাওয়া যায় বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে। সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারবার ছাহাবীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি? ছাহাবীরা স্বীকৃতি দিলে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন'।[৮] এভাবে তিনি দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি করবে।

ইসলামের ইতিহাসে জবাবদিহিতার বাস্তব দৃষ্টান্ত

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর জবাবদিহিতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম খলীফা হিসাবে আবুবকর (রাঃ) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি যে ঐতিহাসিক ভাষণ

৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৯।*

৭. *মুসলিম হা/২৫৮১।*

৮. *মুসলিম হা/১২১৮।*

প্রদান করেন তা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও নেতৃত্বের এক অনন্য দলীল। তিনি ক্ষমতাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক মহান আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি শুরুতেই জনগণের সামনে নিজেকে জবাবদিহিতার আওতাভুক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, أما بعد أيها الناس، فإني قد وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة... 'হে লোকসকল! আমি তোমাদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করি তবে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি আমি ভুল করি তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করে দিবে। সত্যবাদিতা হ'ল আমানত, আর মিথ্যা হ'ল খিয়ানত...।' তিনি আরও বলেন, أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم 'আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। কিন্তু যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তাহ'লে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য নয়'।[৯]

উপরোক্ত ভাষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী নেতৃত্বের মূল ভিত্তি হ'ল জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। আবুবকর (রাঃ) নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করেননি; বরং জনগণকে তাঁর ভুল সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শাসকের আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের অধীন। এ নীতিই ইসলামে জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে। বর্তমান সময়েও রাষ্ট্রপরিচালনা, প্রশাসন ও সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা হ'লে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জনগণের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ওমর ফারূক (রাঃ)-এর শাসনামলে জবাবদিহিতার চেতনা :

ইসলামের ইতিহাসে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খেলাফতকাল ন্যায়বিচার, আমানতদারিতা এবং জবাবদিহিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহিতার জন্য তিনি সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন এবং জনগণের অধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ওমর (রাঃ) বলতেন, إذا نمتُ بالليل ضيَّعتُ نفسي، وإذا نمتُ بالنهار ضيَّعتُ رعيتي 'আমি যদি রাতে ঘুমাই, তাহ'লে নিজের (ইবাদতের) ক্ষতি করি; আর যদি দিনে ঘুমাই, তাহ'লে আমার প্রজাদের অধিকার নষ্ট করি।[১০] এ উক্তি তাঁর দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার গভীর চেতনার পরিচায়ক।

একদিন তিনি প্রচণ্ড রোদে ছাদাক্বার উটের পরিচর্যা করছিলেন। তখন আহনাফ বিন কায়েসকে ডেকে এ কাজে সহযোগিতা করতে বলেন। উপস্থিত একজন ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ কাজ তো কোন গোলামকেও দেওয়া যেত। তখন ওমর (রাঃ) জবাবে বলেন, 'আমার ও আহনাফের চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে? যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে তাদের সেবকস্বরূপ'।[১১]

তাঁর জবাবদিহিতার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল কাপড় বণ্টনের ঘটনা। ইয়ামান থেকে আগত কাপড় জনগণের মধ্যে একটি করে বণ্টন করা হয়। পরে তিনি দু'টি কাপড় জোড়া দিয়ে তৈরি একটি পোষাক পরে খুৎবা দিতে দাঁড়ালে সালমান ফারসী (রাঃ) প্রশ্ন করেন, আপনি একটি করে কাপড় বণ্টন করেছেন, অথচ আপনার পোষাক দু'টি কাপড়ের। তখন ওমর (রাঃ) তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে দাঁড় করান। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, আমি নিজের অংশের কাপড় আমার পিতাকে দিয়েছি। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, এখন আমরা আপনার কথা শুনব ও আনুগত্য করব।[১২]

জবাবদিহিতার ব্যাপারে ওমর (রাঃ) কতটা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন সেটি তার উক্তি থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন, لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة؛ لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة، 'যদি ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তীরে একটি ভেড়াও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তবে আমার ধারণা, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন'।[১৩]

উপরোক্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, ওমর (রাঃ)-এর শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচার। তিনি কখনো নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করেননি; বরং জনগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়াকে নিজের কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনামল বর্তমান বিশ্বের শাসক, প্রশাসক ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

ওমর ইবনুল আব্দুল আযীয (রহ.)-এর জবাবদিহিতার চেতনা :

উমাইয়া খিলাফতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ওমর ইবনুল আব্দুল আযীয (রহ.) ছিলেন ন্যায়পরায়ণতা, তাক্বওয়া, আমানতদারিতা এবং জবাবদিহিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের আমানত এবং এর প্রতিটি ব্যবহার সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ কারণে তিনি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখতেন।

এক রাতে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত অবস্থায় বায়তুলমালের অর্থে কেনা একটি বড় মোমবাতির আলোয়

৯. *মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক, হা/২০৭০২; দারাকুৎনী, আল-মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ, ১/৯২।*
১০. *ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ হা/৬৪৬, মাক্বরীযী, আল-খুত্বাত্ব ১/৩০৮।*
১১. *ইবনুল জাওযী, তারীখু ওমর, ৮৯ পৃ.।*
১২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/১২৩; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ১/২০৩।*
১৩. *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ১/৫৩।*

কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একজন ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে ওমর ইবনুল আব্দুল আযীয (রহ.) সরকারী মোমবাতিটি নিভিয়ে দেন এবং নিজের ব্যক্তিগত অর্থে কেনা একটি ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে বলেন, এখন আপনি আমার ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, সরকারী মোমবাতিটি মুসলমানদের সম্পদ থেকে কেনা হয়েছিল। তাই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা আমার জন্য বৈধ নয়।[১৪]

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে সংরক্ষণ করেছেন এবং সামান্যতম অপব্যবহার থেকেও নিজেকে বিরত রেখেছেন। তাঁর এই সততা ও আল্লাহভীতি জবাবদিহিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাদী বি আমরিল্লাহ-এর জবাবদিহিতা :

আববাসীয় খলীফা মুক্তাদী বি আমরিল্লাহ (৪৬৭-৪৮৭ হি.)-এর মন্ত্রী আবু শুজা-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমাদের প্রতিবেশী একজন বিধবা আছেন, যার চারটি সন্তান রয়েছে। যারা নগ্ন দেহ ও ক্ষুধার্ত। কথাটি শোনার সাথে সাথে মন্ত্রী একজন লোক দিয়ে খাদ্য, বস্ত্র ও কিছু নগদ অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি প্রচণ্ড শীতে নিজের দেহের পোষাক খুলে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এই পোষাক পরবো না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তি আমার নিকট তাদের খবর নিয়ে আসে। লোকটি ছুটে চলে গেল এবং দায়িত্ব পালন করে ফিরে এসে বলল যে, তারা খুবই খুশী হয়েছে এবং মন্ত্রীর জন্য দো'আ করেছে। একথা শোনার পর মন্ত্রী পোষাক পরিধান করলেন।[১৫] শুধু আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহিতা নয় বরং জনগণের নিকটে তাদের অধিকার সম্পর্কে জবাবদিহিতার ব্যাপারে খলীফা কত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন এ ঘটনা তার বাস্তব প্রমাণ। *[ক্রমশ:]*

১৪. সীরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয ১৩৭-৩৮ পৃ.।

১৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১২/১৫০-৫১।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

আমরা মনে করি, নিছক পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় না থেকে এই সুযোগকে বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা উচিত। কেননা তুরস্কের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব, সঊদী আরবের আর্থিক সক্ষমতা এবং পাকিস্তানের নির্ভরযোগ্য পারমাণবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বিকল্প সরবরাহ করবে, যা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে কোন একক শক্তির কাছে যিম্মী হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

তবে ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলিম বিশ্ব এই ধরনের চুক্তি এর আগেও বহুবার দেখেছে। কিন্তু বাস্তবে তা কাজে আসেনি, বরং কাগজেই থেকে গেছে। যেমন ১৯৫০ সালে আরব লীগের 'যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি'-তেও ঠিক একই ভাষা ছিল যে, একের উপর আগ্রাসন মানে সবার উপর আগ্রাসন হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে যখন পরীক্ষার সময় এল, আরব লীগ সম্মিলিতভাবে নড়েও বসেনি। জর্ডান একাই মিসরীয় কম্যাণ্ডের অধীনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব জেরুযালেম ও পশ্চিম তীর হারিয়েছিল মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টায়। ১৯৫৫ সালের বাগদাদ চুক্তি যাতে খোদ পাকিস্তান ও তুরস্কও ছিল। দুই দশকের বেশী টিকেও এই চুক্তি কোন বাস্তব সম্মিলিত প্রতিরক্ষা দিতে পারেনি। আর ২০১৫ সালে সঊদী আরবের নেতৃত্বে গঠিত ৩৪-দেশীয় 'ইসলামিক মিলিটারী কাউন্টার টেররিজম কোয়ালিশন'ও শেষ পর্যন্ত সম্মেলন আর বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, কোন সুসংহত সামরিক জোটে রূপ নেয়নি। সুতরাং মক্কা চুক্তিও যেন কেবল আরেকটি জাঁকালো স্মৃতি না হয়ে যায়। সেজন্য প্রয়োজন হবে প্রকৃত কম্যাণ্ড কাঠামো, নিয়মিত অর্থায়ন, রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা। আর সবচেয়ে বড় কথা, উম্মাহ কেন্দ্রিক ঐক্য গঠনের সদিচ্ছা।

মক্কা শুধু একটা চুক্তির ঠিকানা নয়, বরং এটা মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। এই সীমিত প্রতিরক্ষা সমঝোতা যদি অতীতের ব্যর্থতাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে একটা সুসংগঠিত, দূরদর্শী ও আত্মনির্ভর নিরাপত্তা কাঠামোয় বদলে যায়, তাহ'লে মুসলিম বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে এটাই হয়তো একটা মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হয়ে থাকবে। দরকার শুধু সাহসী নেতৃত্ব, পারস্পরিক আস্থা ও ইসলামী চেতনাবোধ। আজকের বিভক্ত ও অস্থিতিশীল মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর জন্য 'মক্কা চুক্তি' অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই পথ ধরে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক দ্বীনের সঠিক জ্ঞান, সালাফে ছালেহীনের দেখানো পথ এবং উম্মাহ কেন্দ্রিক দৃঢ় ঐক্যের মাধ্যমে আমরা মুসলিম বিশ্বের আত্মমর্যাদা ও সার্বিক নিরাপত্তাকে সুসংহত করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন এবং মুসলিম দেশগুলোর নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করুন- আমীন! *(স.স.)*।

ঘুমহীন রাত, বিধ্বস্ত প্যারেন্টিং

*-জাহিদ হাসান**

রাত ঠিক তিনটা। পুরো পৃথিবী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চারপাশ নিস্তব্ধ, কেবল আপনার ঘরের কোণ থেকে ভেসে আসছে একটা ছোট্ট শিশুর অবিরাম কান্নার সুর। আপনি চোখ কচলাতে কচলাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। কখনো ঘরের এমাথা-ওমাথা হাঁটছেন, কখনো গুনগুন করে তিলাওয়াত করছেন। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, চোখের পাতা দুটো যেন সিসার মতো ভারী হয়ে আসছে। অবশেষে যখন ঘড়ির কাঁটা পৌনে চারটা ছুঁইছুঁই, বাচ্চাটা শান্ত হ'ল, ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আপনার চোখে তখন আর ঘুম নেই, কারণ ঠিক তখনই মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসছে সুমধুর আওয়াজ : 'আছ-ছালাতু খাইরুম মিনান নাওম...'।

পরের দৃশ্যটা সকাল সাতটার। আপনি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বড় সন্তানের স্কুলের টিফিন গোছাচ্ছেন। মাথাটা দপদপ করছে, চোখ দুটো জ্বলছে তপ্ত কয়লার মতো। ঠিক তখনই ডাইনিং টেবিলে একটা শব্দ হ'ল! ছুটে গিয়ে দেখলেন, আপনার আদরের বড় সন্তানের হাত ফসকে দুধের গ্লাসটা পড়ে গেছে টেবিলে। চারদিকে সাদা দুধ গড়িয়ে পড়ছে। এমনিতে আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল একজন মানুষ। সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে মিষ্টি গলায় বোঝান। কিন্তু আজ? আজ আপনার ভেতরের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আপনি হঠাৎ এক তীব্র চিৎকারে ফেটে পড়লেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারি না! কেন সবসময় এমন করো?'

মুহূর্তের মধ্যে পুরো ঘর স্তব্ধ। ছোট্ট সন্তানের চোখের কোণে একরাশ ভয় আর বিস্ময়। সে তার প্রিয় মানুষটির এই রুদ্রমূর্তি দেখে একদম কুঁকড়ে গেল। আর ঠিক তার পরক্ষণেই আপনার বুকের ভেতর হুহু করে নেমে এলো এক প্রচণ্ড অপরাধবোধের সুনামি। আপনি চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন। মনের ভেতর একটা ধারালো প্রশ্ন তীরের মতো বিঁধতে লাগল : 'আমি এমন কেন করলাম?' 'আমি কি একটা খারাপ মা হয়ে যাচ্ছি?' 'আমি কি ব্যর্থ বাবা?' সম্মানিত অভিভাবক, সত্যিটা তবে কী?

যারা জীবনের কোন না কোন মোড়ে এসে নিজেকে এই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনি খারাপ মা কিংবা খারাপ বাবা নন। আপনি স্রেফ ক্লান্ত মা-বাবা, ঘুমহীন মা-বাবা। আর এই দু'টোর মধ্যে আসমান-যমীন তফাত রয়েছে। আপনার ভালোবাসায় কোন কমতি নেই, আপনার সমস্যাটা লুকিয়ে আছে আপনার নিঃশব্দে ফুরিয়ে যাওয়া শক্তির ভাণ্ডারে।

লজিক বনাম ইমোশন : আধুনিক নিউরোসায়েন্স আমাদের মনের ভেতরের এই অদ্ভুত আচরণের একটা চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দেয়। আমাদের মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত একটা অদৃশ্য টানাপোড়েন বা যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধের প্রধান দুই চরিত্র হ'ল, প্রথমত- অ্যামিগডালা : একে বলতে পারেন আমাদের ভেতরের এক অবুঝ, জেদি আর রাগী শিশু। আমাদের সমস্ত আবেগ, ভয়, রাগ আর তাৎক্ষণিক রিফ্লেক্স তৈরি হয় এই ছোট্ট অংশটি থেকে। দ্বিতীয়ত- প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স : এটি আমাদের মস্তিষ্কের ঠিক সামনের অংশের এক বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ মুরব্বী। এর কাজ হ'ল যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা, ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং ঐ অবুঝ শিশুটিকে (অ্যামিগডালা) লাগাম টেনে ধরে রাখা।

যখন আপনি পর্যাপ্ত ঘুমান, শরীর ও মন চাঙ্গা থাকে, তখন আপনার ভেতরের এই বিচক্ষণ মুরব্বী দারুণ সক্রিয় থাকেন। সন্তান টেবিলের ওপর দুধের গ্লাসটা ফেলে দিলে এই মুরব্বী ঝটপট অ্যামিগডালাকে শাসন করে বলে, আরে থামো, শান্ত হও! ওতো ইচ্ছে করে করেনি। ওতো স্রেফ একটা বাচ্চা! ফলে আপনি বিরক্ত হ'লেও চিৎকার করে ওঠেন না। যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক আপনাকে সামলে নেয়। কিন্তু বিপত্তিটা বাঁধে তখনই, যখন আপনার ঘুম কেড়ে নেওয়া হয়। ঘুম-বঞ্চিত মস্তিষ্কে এই দুই সেনাপতির ক্ষমতার ভারসাম্য পুরো উল্টে যায়।

পর্যাপ্ত ঘুম না হ'লে আমাদের যুক্তিবাদী মুরব্বী (প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স) চরম ক্লান্ত হয়ে ঝিমোতে থাকে, তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুরোপুরি কমে যায়। আর এই সুযোগে ভেতরের অবুঝ, রাগী শিশুটি (অ্যামিগডালা) হয়ে ওঠে অতিরিক্ত সংবেদনশীল ও উগ্র। ফলাফল কী দাঁড়ায়? সামান্য একটা অসীলা, এক ফোঁটা দুধ পড়া, একটু খেলনা ছড়ানো কিংবা সন্তানের সাধারণ একটা বায়না, আপনার ক্লান্ত মস্তিষ্ক ওটাকে কোন স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখতেই পায় না। সে ওটাকে একটা 'মস্ত বড় যুদ্ধ' মনে করে অস্বাভাবিক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলে।

প্রিয় অভিভাবক, এটা আপনার চরিত্রের কোন দুর্বলতা নয়, এটা স্রেফ আপনার ক্লান্ত মস্তিষ্কের জীববিজ্ঞান! ঘুম নিয়ে করা নিউরোসায়েন্সের গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, মাত্র এক রাত ঠিকমতো না ঘুমালেই মস্তিষ্কের আবেগীয় প্রতিক্রিয়া প্রায় ৬০% পর্যন্ত বেড়ে যায়! এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলুন আর ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন, যে মা-বাবা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কিংবা মাসের পর মাস ধরে একটা নিটোল ঘুমের মুখ দেখছেন না, তাঁদের মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে প্রতিনিয়ত কী ভয়াবহ ঝড় বয়ে যাচ্ছে!

চারটি চিহ্ন, যা বলে দেয় আপনার বিশ্রাম দরকার : পর্যাপ্ত ঘুম না হ'লে একজন আদর্শ, স্নেহশীল মা-বাবার আচরণেও প্রধানত চারটি স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এগুলো কোন সাধারণ ভুল নয়, এগুলো আসলে আপনার ক্লান্ত শরীরের দেওয়া Red Flags। চলুন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু মিলিয়ে নেওয়া যাক।-

প্রথমত : আবেগ নিয়ন্ত্রণে চরম ব্যর্থতা। স্বাভাবিক ও শান্ত অবস্থায় যে বিষয়টিকে আপনি এক গাল হাসিমুখে সামলে নিতেন, ঘুম-বঞ্চিত অবস্থায় সেই একই বিষয় আপনার চোখে অশ্রু এনে দেয় কিংবা মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। যেমন আপনার ছোট্ট সন্তানটি জুতার ফিতা বাঁধতে গিয়ে বারবার

* *সহকারী শিক্ষক, শান্তি নিকেতন ইন্সটিটিউট, ফেনী।*

ব্যর্থ হচ্ছে। এক রাত ভালো ঘুমের পর আপনি হয়তো পরম মমতায় পাশে বসে তাকে আবার শিখিয়ে দিবেন। কিন্তু রাতভর জেগে থাকার পর? সেই একই দৃশ্য আপনার কাছে মনে হবে এক 'অসহ্য যন্ত্রণা'। আপনি হয়তো চিৎকার করে উঠবেন, নয়তো নিজেই হতাশায় কেঁদে ফেলবেন।

দ্বিতীয়ত : মেজায খারাপ ও সার্বক্ষণিক খিটখিটে ভাব। ঘুম কম হ'লে মন এক অদ্ভুত চাদরে ঢাকা পড়ে যায়, যেখানে সারাক্ষণ বিরক্তি কাজ করে। তখন সন্তানের প্রাণবন্ত হাসির শব্দকে মনে হয় কোলাহল, তার খেলনার আওয়াজকে মনে হয় অত্যাচার, এমনকি জীবনসঙ্গীর খুব সাধারণ একটা প্রশ্নকেও মনে হয় তলোয়ারের খোঁচা! আপনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারেন না, কেন খুব সামান্য কথাতেই ভেতরের মানুষটা এভাবে খিটখিট করে উঠছে।

তৃতীয়ত : অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা। ঘুম-বঞ্চিত মা-বাবার মস্তিষ্ক ছোট ছোট ঘটনাকে তিল থেকে তাল করে দেখে। সন্তান স্রেফ একবার কোন কারণে 'না' বলল, অমনি আপনার মনে হ'তে থাকে, ও তো আমার অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে! বড় হয়ে ও তো আমাকে পাত্তাই দেবে না! একবার হাত থেকে খাবার পড়ে গেল, আপনার মনে হ'ল, ও ইচ্ছা করে আমাকে বিরক্ত করার জন্য এটা করেছে! অথচ একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে বুঝতেন, এগুলো নিছকই শিশুর স্বাভাবিক ও চিরচেনা শিশুসুলভ আচরণ।

চতুর্থত : এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল মন। ঘুমহীনতা সরাসরি আমাদের স্মৃতিশক্তি আর মনোযোগের ওপর থাবা বসায়। যেমন সন্তানের স্কুলের টিফিন বক্সে খাবার দিতে ভুলে যাওয়া। যরূরী দরকারি কাগজ বা ঘরের চাবিটা কোথায় রাখলেন, কিছুতেই মনে না পড়া। একই কথা কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুইবার বলে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো কিন্তু আপনার অগোছালো স্বভাবের লক্ষণ নয়। এগুলো হ'ল আপনার ক্লান্ত, অবসন্ন মস্তিষ্কের এক নিঃশব্দ আর্তনাদ! যদি এই চারটি লক্ষণের কোন একটি বা প্রতিটিই ইদানীং নিজের মধ্যে খুঁজে পান, তবে বুকের ওপর হাত রেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলুন। কারণ সমস্যাটা আপনার প্যারেন্টিং দক্ষতায় বা আপনার ভালোবাসায় নেই; সমস্যাটা স্রেফ লুকিয়ে আছে আপনার বালিশের নীচে, আপনার অপর্যাপ্ত ঘুমের মাঝে।

ঘুম নিয়ে ইসলাম কী শেখায় : এখানে এসে একটা মস্ত বড় মনস্তাত্ত্বিক ভুল ভাঙ্গা দরকার। আমাদের যান্ত্রিক সমাজে ঘুমকে বড্ড সস্তা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এখানে ঘুম মানেই যেন 'অলসতা', ঘুম মানেই যেন 'সময় নষ্ট'। বিশেষ করে নতুন মা-বাবাদের ওপর যেন এক অদৃশ্য সামাজিক চাপ দেওয়া হয়। চারপাশ থেকে অভিজ্ঞ মুরব্বীরা শোনান, আরে, সন্তানের জন্য তো একটু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে! নিজের ঘুম-খাওয়া হারাম না করলে কিসের মা-বাবা? কী অদ্ভুত এক দর্শন, তাই না? অথচ দয়াময় আল্লাহ তার পবিত্র কালামে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন, এক পরম সৌন্দর্যের দৃষ্টিভঙ্গি শিখিয়েছেন। কুরআন আমাদের বলে, ঘুম কোন বিলাসিতা নয়; ঘুম হ'ল এক মহিমান্বিত নে'মত। আল্লাহ বলেন, 'আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ' *(আর-রূম ৩০/২৩)*।

একটু গভীরভাবে খেয়াল করুন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূর্য, চন্দ্র, আকাশ আর নক্ষত্ররাজির মতো বিশাল সৃষ্টিকে কুরআনে তাঁর 'নিদর্শন' বলেছেন। আর ঠিক সেই মহাজাগতিক তালিকার ভেতরেই তিনি শামিল করেছেন মানুষের এই 'ঘুম'কে! অন্যত্র তিনি এর উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন : 'এবং আমি তোমাদের ঘুমকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী *(নাবা ৭৮/৯)*। তাহ'লে সমীকরণটা কী দাঁড়াল? ঘুম কোন অপচয় নয়, ঘুম আল্লাহ্‌র দেওয়া এক নে'মত, যা আমাদের ক্লান্ত শরীরকে প্রতি রাতে সতেজ করে।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে সবসময় এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখিয়েছেন। তিনি শুধু পরকালের পথই দেখাননি, বরং এই নশ্বর শরীরটাকে কীভাবে সতেজ রাখতে হয়, তাও শিখিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতের আগে ঘুমানো এবং এশার ছালাতের পর অহেতুক গল্পগুজবে মেতে থাকাকে অত্যধিক অপসন্দ করতেন, যাতে রাতের বিশ্রামটা নিখুঁত ও সময়মতো হয়। শুধু তা-ই নয়, ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে দুপুরের দিকে সংক্ষিপ্ত একটা বিশ্রামের নিয়ম চালু ছিল, যাকে আমরা হাদীছের পরিভাষায় বলি 'কায়লুলাহ' (Power Nap)।

ইসলামের একটি মৌলিক সোনালী নীতি হ'ল 'নিশ্চয়ই আপনার ওপর আপনার শরীরের অধিকার রয়েছে'। তাহ'লে পুরো বিষয়টার সারমর্ম কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি যখন রাতে বিছানায় গিয়ে নিজের ঘুমের যত্ন নিচ্ছেন, তখন আপনি আল্লাহ্‌র দেওয়া সবচেয়ে বড় আমানত, আপনার সন্তান, আপনার পরিবারকে, পরের দিন সুন্দরভাবে আগলে রাখার এক মহৎ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মনে রাখবেন, একজন ক্লান্ত, চোখ জ্বলা, বিধ্বস্ত মা-বাবা তাঁর সন্তানকে সর্বোচ্চ যতটুকু মায়া দিতে পারেন, তার চেয়ে হাযার গুণ বেশী ভালোবাসা ও ধৈর্য দিতে পারেন একজন সুস্থ ও বিশ্রামপ্রাপ্ত মা-বাবা। তাই নিজের ঘুমের যত্ন নিন। কারণ আপনার সুস্থ মনের ওপরই নির্ভর করছে আপনার সন্তানের সুন্দর শৈশব।

পাঁচটি বাস্তবসম্মত সমাধান : এখানে এসে আপনি হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন, আপনার কথাগুলো বইতে বা টেক্সটে পড়তে বড্ড সুন্দর লাগে। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল, ঘরে যখন পিঠাপিঠি দু'টো ছোট বাচ্চা থাকে, তখন টানা আট ঘণ্টার একটা নিটোল ঘুম আরব্য রজনীর রূপকথার মতোই শোনায়!' আপনার এই যন্ত্রণার সাথে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি। আমি নিজেই এটার ভুক্তভোগী। গত কয়েক বছরে রাতে বাচ্চাদের সাথে থাকার সময় টানা তিন থেকে চার ঘন্টা ঘুমাতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। আসলে বর্তমান সময়ে প্যারেন্টিং কোন ল্যাবরেটরির নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ নয়, এটা একটা জীবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র। তাই এখানে আমাদের সমাধানগুলোও হ'তে হবে একদম মাটি কামড়ানো, বাস্তবসম্মত আর কার্যকরী। চলুন, এমন পাঁচটি উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

১. চুরি করে হ'লেও ঘুমিয়ে নিন এবং যৌথ দায়িত্ব বণ্টন করুন। শুনতে একটু চোর-চোর মনে হ'তে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, ছোট বাচ্চার মা-বাবাকে মাঝেমধ্যে সুযোগ বুঝে ঘুম 'চুরি' করতেই হয়! আমাদের মায়েরা একটা মস্তবড় ভুল করেন। বাচ্চা যখনই ঘুমায়, মায়েরা তখন ভাবেন, আহ! এই সুযোগে ঘরের জমে থাকা কাজগুলো সেরে ফেলি। তাঁরা রান্না চড়ান, ঘর মোছেন, কাপড়ের পাহাড় কাচতে বসেন। সম্মানিত অভিভাবক! সিঙ্কভর্তি নোংরা থালাবাসন কিংবা ঘরের ধুলোবালি পরে পরিষ্কার করা যাবে, ওগুলো কোথাও পালিয়ে যাবে না। কিন্তু আপনার মস্তিষ্কের হারিয়ে যাওয়া বিশ্রাম পরে আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই বাচ্চা ঘুমানোর সাথে সাথেই সংসারের বাকী কাজকে 'তালা' মেরে নিজের চোখের পাতা দু'টো বন্ধ করে নিন।

স্বামী-স্ত্রী মিলে যদি একটি সুন্দর সমঝোতায় আসেন, তবে এই যুদ্ধ জয় করা সহজ হয়। আপনারা নাইট শিফট বা রাতের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারেন। যেমন একদিন বাবা একটু রাত জেগে বাচ্চার দেখভাল করবেন, যেন মা অন্তত কয়েক ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমাতে পারেন। আর অন্যদিন মা দায়িত্ব নিলেন। আবার এটা এমন যেন না হয়, চাকরির মত চাপিয়ে দেওয়া। বরং সুন্দরভাবে সমঝোতার ভিত্তিতেই করতে হবে। এছাড়া আপনি যদি যৌথ পরিবারে থাকেন, তবে দাদি, নানি, খালা বা ফুফুর সাহায্য নেওয়াটা মোটেও লজ্জার বা সংকোচের কিছু নয়। অনেকে ভাবেন, আমার বাচ্চা, আমি কেন অন্যকে দেব? না, সম্মানিত অভিভাবক! এটি কোন দুর্বলতা নয়, বরং আপনার মানসিক সুস্থতা টিকিয়ে রাখার এক অনন্য প্রজ্ঞার পরিচয়। কারণ প্রয়োজনটা শুধু আপনার।

২. পাওয়ার ন্যাপ বা কায়লুলাহর অভ্যাস গড়ে তুলুন। রাতের ঘুম যদি কোন কারণে ভাঙাচোরা হয়, তবে দিনের আলোয় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এক চমৎকার সমাধান। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেকে একে বলে Power Nap, আর আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আমাদের প্রিয় নবীজি (ছাঃ)-এর নাম দিয়েছেন 'কায়লুলাহ'। দুপুরের দিকে মাত্র ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের একটা সংক্ষিপ্ত ঘুম বা বিশ্রাম আপনার ক্লান্ত মস্তিষ্ককে অবিশ্বাস্যভাবে চাঙ্গা করে তুলতে পারে। হ্যাঁ, এটা হয়তো আপনার রাতের ৮ ঘণ্টার নিটোল ঘুমের বিকল্প হবে না, তবে রাতের ঘুমের ঘাটতি আর মস্তিষ্কের ক্লান্তি দূর করতে এটি ঔষধের মতো কাজ করবে।

ধরুন, যোহরের ছালাত শেষ করলেন। দুপুরের খাবার পর আপনার সন্তানটি যখন একটু শান্ত হয়ে খেলছে বা বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, ঠিক সেই সময়টায় আপনিও পাশে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন। অনেকে বলবেন, শুলেই তো আমার ঘুম আসে না! কোন সমস্যা নেই! ঘুম না এলেও স্রেফ ঘরের লাইটটা নিভিয়ে, মোবাইলটা দূরে রেখে ২০ মিনিট চোখ বন্ধ করে নিথর শুয়ে থাকাটাই আপনার জট পাকানো মস্তিষ্ককে একদম রিসেট করে দিবে।

৩. সন্তানকে আগেভাগে ঘুমাতে শেখান। প্যারেন্টিংয়ের একটা গোল্ডেন রুল হ'ল, সন্তানের ঘুমের রুটিন যদি ঠিক থাকে, তবে পিতা-মাতার রাতটাও অনেকটা গোছানো আর শান্তিময় হয়। সন্তান যদি মাঝরাত পর্যন্ত জেগে হুলস্থুল করে, তবে আপনার মেজায ঠিক রাখা আসলেই অসম্ভব। আর এই জায়গাটায় আমাদের ইসলামী আদবগুলো কী দারুণ মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়! ঘুমানোর আগে শিশুকে ওযূ করানো, বিছানা ঝেড়ে নেওয়া, ডান কাতে শোয়ানো এবং ঘুমের দো'আ পড়ানো, এই ছোট ছোট মিষ্টি অভ্যাসগুলো কেবল আধ্যাত্মিক আমলই নয়, এগুলো আসলে শিশুর অবচেতন মস্তিষ্কের কাছে একটা 'শান্ত হওয়ার সংকেত' পাঠায়।

প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটায় যখন রাত সাড়ে নয়টা/দশটা বাজবে, ঘরের সব উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে দিন। হালকা ডিম লাইট জ্বেলে সন্তানকে ডান কাতে শুইয়ে দিন। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুমের দো'আগুলো পড়ুন কিংবা ঈমান জাগানিয়া কোন ছোট গল্প শোনান। শুরুর প্রথম দুই-এক সপ্তাহ হয়তো বাচ্চা একটু ছটফট করবে, ঘুমাতে চাইবে না। কিন্তু হাল ছাড়বেন না। যখন এই রুটিনটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, তখন সাড়ে আটটা বাজলেই শিশুর শরীর ও মস্তিষ্ক নিজে থেকেই ঘুমের জন্য তৈরী হয়ে যাবে। আর এতে করে আপনিও রাত দশটার মধ্যে নিজের কাজ শেষ করে একটা চমৎকার বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে যাবেন। যদিও বর্তমান সময়ে আমাদের অসচেতন লাইফস্টাইলের কারণে এটা খুবই কঠিন, তবে আমাদের চেষ্টা করে যেতেই হবে।

৪. সময় ব্যবস্থাপনার জ্ঞান আয়ত্ত করুন। অনেক মা-বাবা রাতে যে শুধু সন্তানের কান্নার জন্য জেগে থাকেন, তা কিন্তু নয়। অনেক সময় দেখা যায়, সন্তান ঠিকই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু পিতা-মাতা জেগে আছেন। কেন? কারণ সারাদিনের জমে থাকা কাজের পাহাড় ঠেলতে ঠেলতেই ঘড়ির কাঁটা মাঝরাত পার করে ফেলেছে। এই ভুল কাজটা সংশোধন প্রয়োজন। ইসলাম আমাদের সময়ের প্রতি এক গভীর এবং নিখুঁত সচেতনতা শিখিয়েছে।

সময়ের সঠিক ব্যবহার মানে নিজেকে একটা ২৪ ঘণ্টার রোবট বানিয়ে ফেলা নয়; বরং সঠিক সময়ে সঠিক কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আমাদের অনেক পিতা-মাতার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রোগ কাজ করে। যার নাম, পারফেকশনিজম বা সব কিছু নিখুঁত করার এক অদ্ভুত তাড়না। ঘর একদম ঝকঝকে থাকতে হবে, রান্না নিখুঁত হ'তে হবে, জামাকাপড় সব এখনই ইস্ত্রি হ'তে হবে! প্রতিদিন সকালে বা আগের দিন রাতে ছোট্ট একটা কাজের তালিকা তৈরি করুন। সেখান থেকে সবচেয়ে যরূরী ৩-৪টি কাজ দিনের আলো থাকতেই শেষ করে ফেলুন। যে কাজটি আগামীকাল করলেও কোন ক্ষতি হবে না, সেটি জোর করে নিজের ঘুম হারাম করে আজ রাতে শেষ করার কোন প্রয়োজন নেই। মনে রাখবেন, একটা রাত জাগা, ক্লান্ত ও খিটখিটে নিখুঁত পিতা-মাতা হওয়ার

চেয়ে, ঘর কিছুটা অগোছালো রেখে একজন হাসিখুশি ও বিশ্রামপ্রাপ্ত যথেষ্ট ভালো পিতা-মাতা হওয়া সন্তানের মানসিক বিকাশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে হাযার গুণ বেশী উপকারী।

৫. ঘুমের মান উন্নত করার মনস্তত্ত্ব। কখনো কখনো সমস্যাটা কিন্তু ঘুমের পরিমাপে বা ঘণ্টায় হয় না; সমস্যাটা হয় ঘুমের মানে বা গভীরতায়। অনেকেই অভিযোগ করেন, আমি তো রাতে ৭-৮ ঘণ্টাই বিছানায় ছিলাম, তাও সকালে ওঠার পর মনে হয় যেন সারা শরীর ভেঙে আসছে! মাথাটা কেমন জট পাকিয়ে থাকে। যদি আপনার সাথেও এমনটা ঘটে থাকে, তবে বুঝবেন আপনার শরীর হয়তো বিছানায় ছিল, কিন্তু আপনার মস্তিষ্ক গভীর ঘুমে যেতে পারেনি। চলুন, ঘুমের মান উন্নত করার কিছু বাস্তবসম্মত কৌশল জেনে নেই।

ঘুমানোর অন্তত আধা ঘণ্টা আগে ঘরের সমস্ত ডিজিটাল স্ক্রিণ, মোবাইল, ল্যাপটপ, টেলিভিশন একদম বন্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখুন। বিজ্ঞানের ভাষায়, এই স্ক্রিনগুলো থেকে যে 'নীল আলো' বের হয়, তা আমাদের মস্তিষ্ককে ধোঁকা দেয়। মস্তিষ্ক মনে করে এখনও দিন রয়ে গেছে! ফলে ঘুম আসার হরমোন মেলাটোনিন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। আপনার শোবার ঘরটি যতটা সম্ভব অন্ধকার ও শান্ত রাখুন। মৃদু আলো বা ঘুটঘুটে অন্ধকার মস্তিষ্ককে দ্রুত শান্ত হ'তে সাহায্য করে। এছাড়া রাতে দেরী করে এবং অতিরিক্ত মসলাদার বা ভারী খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। কারণ হজমের গোলমাল ঘুমের গভীরতা কমিয়ে দেয়।

মস্তিষ্ককে ফাঁকা রাখুন। এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি সাইকোলজিক্যাল ট্রিক। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনের যত দুশ্চিন্তা, আগামীকালকের কাজের চাপ কিংবা মনের ভেতরের ক্ষোভ সব একটা কাগজে বা ডায়েরিতে লিখে ফেলুন। যখন আপনি মনের কথাগুলো কাগজে ঢেলে দিবেন, মস্তিষ্ক তখন ভাববে, যাক, দায়িত্ব শেষ, এখন আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। সবশেষে বালিশে মাথা রেখে প্রিয় নবীজির শেখানো তাসবীহ (৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার) পাঠ করুন। তাছাড়া ঘুমের অন্যান্য দো'আ ও কুরআন তিলাওয়াত করে ঘুমান। এটি আপনার সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে আত্মায় এমন এক অলৌকিক প্রশান্তি এনে দিবে, যা আপনাকে পরের দিন সকালে এক প্রাণবন্ত ও বিধ্বস্তহীন সকাল উপহার দিবে, ইনশাআল্লাহ।

শেষ কথা : আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, একজন মাতা বা পিতা কতটা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তার সন্তানকে লালন-পালন করতে পারবেন, তা কোন অলৌকিক কৌশলের ওপর নির্ভর করে না। এটা অনেকখানি নির্ভর করে তিনি নিজে শারীরিক ও মানসিকভাবে কতটা সুস্থ, শান্ত এবং বিশ্রামপ্রাপ্ত আছেন তার ওপর। একটি শূন্য পাত্র থেকে যেমন অন্য কারও তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এক ফোঁটা পানিও ঢেলে দেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি নিজের ভেতরের শান্তি ও শক্তির পাত্রটি শূন্য রেখে সন্তানকে প্রশান্তি দেওয়া অসম্ভব। নিজের পাত্রটা আগে ভরাতে হয়, তবেই তা অন্যকে বিলিয়ে দেওয়া যায়।

তাই পরের বার যখন সন্তানের খুব সামান্য দুষ্টুমিতে আপনার মেজায চড়ে যাবে, যখন আপনার হাত বা কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ হারাবে, তখন নিজেকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চাবুক মারার আগে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে স্রেফ একটি প্রশ্ন করুন 'আমি কি গত রাতে ঠিকমতো ঘুমিয়েছি?' হয়তো এই একটা সরল প্রশ্নের উত্তরই আপনাকে বলে দিবে আসল সমস্যাটা কোথায় ছিল। তবে এখানে এসে আমাদের আরও একটি রূঢ় ও নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। বর্তমান সময়ে এসে প্যারেন্টিংয়ের যুদ্ধটা আমাদের পিতা-দাদাদের আমলের চেয়ে হাযার গুণ বেশী কঠিন হয়ে গেছে।

আজকের দিনে শুধু একটা সুন্দর ঘুমের রুটিন বানালেই যে বাচ্চা টুক করে ঘুমিয়ে পড়বে, বিষয়টা এত সহজ নয়। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে চারপাশে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চোখ ধাঁধানো আলো। ঘরের বাতাসে অদৃশ্য বিষের মতো ছড়িয়ে থাকা ওয়াইফাই আর ডিভাইসের রেডিয়েশন। শহুরে ফ্ল্যাট কালচারের চার দেয়ালের মাঝে আটকে থাকা বন্দি শৈশব, যেখানে শিশুর অতিরিক্ত শক্তি খরচ করার মতো কোন খেলার মাঠ নেই। এই সব কিছু মিলে আজকের শিশুদের স্বভাবকে এক ধরনের 'হাইপার-অ্যাক্টিভ' বা অতিরিক্ত চঞ্চল করে তুলেছে। অনেক পিতা-মাতা ইন্টারনেটের শত শত ট্রিকস ফলো করেও বাচ্চাকে সময়মতো ঘুমাতে নিতে পারেন না। রাত একটা-দুইটা বেজে যায়, শিশু বিছানায় ছটফট করে কিন্তু তার চোখের পাতা এক হয় না। এটি কেবল কোন অবাধ্যতা নয়, এটি আমাদের আধুনিক লাইফস্টাইলের তৈরি করা এক মারাত্মক মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি!

এত কিছুর পরেও এই প্রতিকূল স্রোতের মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, আমাদের সন্তানদের আগলে রাখতে হবে। সব ট্রিকস হয়তো প্রতিদিন কাজ করবে না, কোন কোন রাত হয়তো ভীষণ বিধ্বস্ত কাটবে। কিন্তু সেই কঠিন রাতেও আমাদের মনে রাখতে হবে, হাল ছাড়া যাবে না। প্রযুক্তির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ যতটা সম্ভব বাড়াতে হবে, দিনের বেলায় শিশুকে শারীরিক পরিশ্রম বা ছোটাছুটির সুযোগ দিতে হবে, আর ঘরের পরিবেশকে করতে হবে আরও শান্ত। মনে রাখবেন, আপনি জীবনের যে কাজই করুন না কেন, একটা নিটোল ও প্রশান্ত ঘুমের পর সেই একই কাজ আপনি আরও সুন্দর, আরও নিখুঁতভাবে করতে পারবেন। নিজের শরীরের প্রতি দয়া করা কোন বিলাসিতা নয়, এটি আপনার সন্তানের প্রতি আপনার দায়িত্বেরই একটা অংশ।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে গভীর আকুতি জানাই, তিনি যেন আমাদের দেশের, আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্লান্ত পিতা-মাতাকে রাতের বেলা এক টুকরো প্রশান্তির ঘুম দান করেন। আর সেই ঘুম ও বিশ্রামের বরকতে তাদের ভেতরের শক্তিকে এমনভাবে পুনরুজ্জীবিত করে দেন, যেন সন্তান লালন-পালনের এই মহান ও পবিত্র আমানত রক্ষা করার দায়িত্বটি তাঁদের জন্য সহজ, আনন্দময় ও বরকতময় হয়ে ওঠে- আমীন!

আদর্শের শক্তিতে নিয়মের পূর্ণতা

-সারওয়ার মিছবাহ

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন আদব-আখলাক, পড়াশোনার আগ্রহ, শৃংখলা ইত্যাদির বেশ ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। আখেরাতমুখী চিন্তাধারার অভাব এবং পশ্চিমাপ্রেম ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এগুলো সমাধান করতে আমরা নতুন নতুন নিয়ম-কানুন তৈরী করছি। তবে অনেকগুলো নিয়ম তৈরী করার পরেও যেন সমস্যা দূর হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, নিয়ম প্রয়োগ করতে গেলে শিক্ষার্থীরা মানিয়ে নিতে পারছে না। পরিবেশের সাথে খাপ খাচ্ছে না। নিয়ম নিয়েই যেন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমরা সবাই মিলে বাইন মাছ শিকারে নেমেছি। চাপ দিয়ে ধরতে গেলেই পিছলে যাচ্ছে। তখন আমরা ভাবছি, আমাদের নিয়ম-কানুনে সমস্যা। অথবা আমরা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দুর্বল। তাছাড়া এমন হবে কেন! আমাদের মনে হয়, এই পরিস্থিতিগুলো আমাদের একটু ভিন্নভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

এই সফরের শুরুতেই আমাদের শান্ত ও ধীরস্থীর হ'তে হবে। বুকের ভেতরে ঠিক অনেকটা ধৈর্য, শক্তি ও সাহস নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করতে হবে। দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার পরে এমন কোন সমস্যা থাকার কথা নয়, যার সমাধান ইসলামে নেই। তাই সব আধুনিক সমস্যার আধুনিক সমাধান না খুঁজে কিছু ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার পুরনো সমাধান খুঁজতে হবে। যে ধারা আল্লাহ প্রদত্ত, যে ধারা সালাফে ছালেহীন গ্রহণ করেছেন, যে ধারা হাযার বছরের পরীক্ষিত; সেই ধারার কার্যক্ষমতা বরাবরই বেশী হবে। এটাই স্বাভাবিক। আমরা আজ তেমনই একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করব। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও আদর্শিক ক্লান্তি লগ্নে যার সুন্দর প্রয়োগ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় খুবই প্রয়োজন।

আমরা জানি, নিয়ম মানুষকে বেঁধে রাখতে পারে; আকৃষ্ট করতে পারে না। লিখিত নিয়মের শৃংখল মানুষকে কেবল ভালোলাগার অভিনয় করাতে পারে। ভালোবাসাতে পারে না। কোন কাজ মন থেকে করাতে পারে না। কারণ নিয়ম হ'ল লিখিত শিকল। অদৃশ্য শিকল, যা দেখা যায় না। আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হ'ল শিক্ষার জায়গা। এটা কোন জেল-হাজত নয়। মানুষ শিখতে ভালোবাসে। অনুসরণ করতে ভালোবাসে। কাউকে অনুসরণ করতে গিয়ে সে সকল কষ্ট সহ্য করতে পারে।

আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব যে, ইসলাম মানুষের কাঁধে নিয়মের বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। ইসলাম একটি আদর্শকে সামনে রেখে শুধু অনুসরণ করতে বলেছে। কারণ মানুষ সর্বদা দেখে দেখে শেখে। মানুষ অপরের সুখ-দুঃখের বাটখারা দিয়ে নিজের সুখ-দুঃখ মাপে। অপরকে দেখে সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এজন্যই একটা সংকীর্ণ জীবন ব্যবস্থা একজনের জন্য কষ্টকর হ'লেও একসাথে একশজনের জন্য কষ্টকর হয় না। সবাই বাকী নিরানব্বই জনকে দেখে নিজেকে শান্তনা দিয়ে সেটার ওপরেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। একসময় তারা এতটুকুর মাঝে সুখও খুঁজে নেয়। মানুষকে মূলত তৈরীই করা হয়েছে এভাবে।

এখন আমরা চাচ্ছি, নিয়মের বেড়াজালে ফেলে সবাইকে ভাল বানিয়ে ছাড়ব। কিন্তু ভাল হওয়ার আগ্রহ আসে অনুশোচনা থেকে। আর নিয়ম কখনো মানুষের অনুশোচনা তৈরী করতে পারে না। মানুষের আবেগকে ধাক্কা দিতে পারে না। ফলে নিয়মের চাপে মানুষ ভাল হয় না। আমরা যদি বুঝতে পারি যে, উত্তম আদর্শই মানুষকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করতে পারে। তবে আমাদের সময় ও শ্রম নষ্ট না করে সেই আদর্শকেই গুরুত্ব দেয়া দরকার। এর মাঝেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান খোঁজা দরকার। তা না করে আমরা পড়ে আছি কেবল আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে আর নিত্যদিনে হাযার নিয়মের পসরা সাজিয়ে নিয়ে। যা কেবল আমাদের শ্রমই নষ্ট করছে।

তাই বলা যায়, সমস্যা আমাদের নিয়মে নয়। সমস্যা হ'ল, আমাদের ব্যর্থতা। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সামনে আদর্শিক ভিত্তি রাখতেই পারিনি। আদর্শিক আলোচনায় হয়ত আমাদের বিচারই সবার আগে করা দরকার হবে। কারণ আমরা কথায় কথায় অভিযোগ করি, আমাদের শিক্ষার্থীরা এমন কেন? তারা কেন বে-আদব হয়ে যাচ্ছে? তারা কেন পড়াশোনায় রাত্রি জাগরণ করছে না? তাদের পোশাক-আশাক কেন এমন? তাদের মুখের ভাষা কেন এমন? অথচ আমরা এই আলোচনা কখনো সামনে আনি না যে, শিক্ষক হিসাবে তাদের সামনে আমরা কতটুকু আদবের পরিচয় দিয়েছি। আমার ছাত্রদের সামনে আমি আমার শিক্ষকের সাথে কেমন আচরণ করেছি? দারস, অনুষ্ঠান, সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা কেমন পোশাকে তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি? প্রচণ্ড রাগের মাথায় তাদের সামনে কেমন ভাষায় কথা বলেছি?

বরং এমন হয়েছে যে, সুন্দর আদব যে কেমন হয় এটা তারা কখনো দেখেইনি। নরম-মিষ্টি কথা যে কেমন হয় তা কখনো তারা শোনেইনি। তারা কখনো কাউকে রাত জেগে পড়তে দেখেনি। তারা তাদের যুবক শিক্ষককে মাদ্রাসার বৃদ্ধ ঝাড়ুদার বা দারোয়ানের সাথে সম্মান বজায় রেখে কথা বলতে দেখেনি। তারা তাদের শিক্ষকদের কখনো কাঁদতে দেখেনি। না দো'আয়, না আলোচনায়। তারা তাদের শিক্ষকদের কখনো তাহাজ্জুদের ছালাতে দাঁড়াতে দেখেনি। তারা তাদের শিক্ষকদের কথাবার্তায় কখনো পশ্চিমা বিদ্বেষ শোনেনি। এখানে দোষ কার? অবশ্যই আমাদের। এজন্য আমাদের বিচারই সবার আগে হওয়া দরকার। কারণ শিক্ষক হয়ে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আদব শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছি।

আমরা যদি নিয়ম করে দেই যে, বড়দের দেখলে সালাম দিতেই হবে। তবে এই কাজ শুধু তারা মাদ্রাসার ভেতরে করবে, বাইরে করবে না। কারণ এটা নিয়মের মধ্যে পড়ে। তার আদর্শের মধ্যে পড়ে না। যদি বলি, বাধ্যতামুলক ফজরের আগে তাহাজ্জুদ পড়তেই হবে। দো'আ করতেই হবে। তবে এই নিয়ম পালনে হয়ত কিছু ছাত্র শেষ রাতে উঠে ওযু ছাড়াই ছালাত আদায় করবে। বা ছালাত-দো'আর অভিনয় করবে। প্রকৃতার্থে সে কোনদিন তাহাজ্জুদে আকৃষ্ট হবে না। কারণ তাহাজ্জুদের যে সৌন্দর্য রয়েছে, দো'আর মাঝে যে স্নিগ্ধতা রয়েছে তা অবলোকন ব্যতীত একজন মানুষ তাতে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। সুন্নাতী লেবাসের মাঝে যে উৎকৃষ্টতা রয়েছে তা অনুভব করা ছাড়া কেউ কখনোই তা মন থেকে গ্রহণ করতে পারবে না।

এজন্য আমরা যে ভাল কাজগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখতে চাই সেগুলো নিয়মের ভেতরে না এনে সেগুলোর সৌন্দর্য তুলে ধরাই অধিক ফলদায়ক হবে। কারণ সৌন্দর্যকে মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। আজ বা কাল, শিক্ষার্থীরা

সেগুলো গ্রহণ করবেই! সেগুলোর জন্য তারা সর্বোচ্চ কষ্টও সহ্য করবে ইনশাআল্লাহ। আমরা বেশ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান দেখেছি। এমনও প্রতিষ্ঠান দেখেছি, যেখানে ছাত্ররা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত তো জামা'আতে আদায় করেই পাশাপাশি তাহাজ্জুদও আদায় করে। তবে মাদ্রাসায় এমন কোন লিখিত নিয়ম নেই যে, তাহাজ্জুদ আদায় করতেই হবে।

আমরা বাংলাদেশী ছাত্রকে বাংলার চেয়ে বেশী উর্দূকে ভালোবাসতে দেখেছি। ভালোবেসে উর্দূ চর্চা করতে দেখেছি। অথচ মাদ্রাসায় এমন কোন লিখিত নিয়ম নেই যে, উর্দূ চর্চা করতেই হবে। তাদেরকে আমরা রাত জেগে আরবী চর্চা করতে দেখেছি। অনেককে তীব্র গরমে সারাদিন পাগড়ী পরিধান করে থাকতে দেখেছি। অথচ এটাও প্রতিষ্ঠানের কোন লিখিত নিয়ম নয়। পাগড়ীর কথা শুনেই কওমী প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল পড়ুয়াদের কথাই বলছি। আপনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে খেয়াল করলে জুব্বা-পাগড়ী পরা হুযুরদের বিচরণ দেখতে পাবেন। তবে কার্যত তারা হুযুর নয়। এগুলো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নয়। তারপরেও এগুলো তারা কেন করছে? কারণ এগুলোর সৌন্দর্য তাদেরকে দেখানো হয়েছে। তারা এগুলোকে ভালোবেসে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে আমাদের শিক্ষার্থীরা উল্টো জিনিসগুলোকে ভালোবাসে। এর কারণ হ'ল, শিক্ষার্থীদের হৃদয়ের জমিতে আমরা ভুল বীজ বপন করেছি। এই ভুল আমাদের মাধ্যমেই হয়েছে। যখন গাছে ফল এসেছে তখন আমরা 'নিয়ম' নামের বালাইনাশক দিয়ে গাছের ফল পরিবর্তন করার বৃথা চেষ্টা করেছি। কিন্তু বালাইনাশক দিয়ে কি তেঁতুল গাছে আম ধরানো সম্ভব? না। গাছের ফল পরিবর্তন করতে হ'লে বীজের কৌটা পরিবর্তন করতে হবে। যে ফল আমরা চাই, সেই ফলের চাষ আর কারা কোথায় করে, সেটা জানতে হবে। তারা কোন বীজ ব্যবহার করে, সেই বীজ আমাদেরকেও সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া দামী ফলের চাষ সম্ভব নয়।

আমরা অবশ্য বীজ বপনের পদ্ধতি সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকেফহাল নই। আমরা মনে করি, বীজ জমিতে ফেলার পরে জমিকে বলতে হবে যে, 'চারা তৈরীর কাজ শুরু কর'। তবে বাস্তবতায় জমিকে কিছুই বলতে হয় না। শুধু সঠিক বীজটা দিতে হয়। ঠিক তেমনই শিক্ষার্থীদের বলতে হয় না যে, 'এটা কর'। কারণ তারা কাজ করার জন্যই এসেছে। শুধু তাদেরকে দেখাতে হবে যে, কি করতে হবে। শিক্ষকগণ যদি নিজেদের মাঝে আরবীতে কথা বলেন তবে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে না যে, তোমরাও আরবী বল। শিক্ষকগণ যদি আতরওয়ালা হন, তবে শিক্ষার্থীদের মাঝে হাযার রকম সুবাস এমনিতেই ছড়িয়ে পড়বে।

আমার ছাত্রজীবনে শিক্ষক আমাদের সাথেই থাকতেন। বড় রুমের একপাশে তার থাকার জায়গাটা পর্দা দিয়ে ঘেরা ছিল। আমরা পর্দার এপাশে থাকতাম। তিনি থাকতেন ভেতরে। শেষ রাতে চাপা কান্নার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যেত। আমরা পর্দার বাইরে থেকে শিক্ষকের রোনাজারীর শব্দ বেশ ভালভাবেই শুনতে পেতাম। সত্যি কথা বলতে তখন আর আমরা ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম না। আমাদের মনে হ'ত, তিনি এত ভাল মানুষ। তারপরেও এত কান্নাকাটি করে দো'আ করছেন। আমরা তো সারাদিন শুধু গুনাহই করি। না! একটু উঠি। তারপর আমরাও একে একে উঠে ওযু করে ছালাতে দাঁড়াতাম। আমরাও কান্না করতাম। অন্তরে জমে থাকা চাপা কষ্ট-গ্লানি সব পরিস্কার হয়ে যেত। একটি প্রফুল্ল ও উদ্যমী হৃদয় নিয়ে আমরা ফজরের ছালাতে উপস্থিত হ'তাম। এটাই হ'ল বীজ বপনের নিয়ম।

আমাদের হয়ত বুঝাতে পেরেছি যে, মানুষ গড়তে আদর্শিক ভিত্তির বিকল্প নেই। আর নিয়ম তো কখনোই আদর্শের বিকল্প হ'তে পারে না। তাই আমাদের শিক্ষকদের এখন থেকেই 'আদর্শ' হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। আদর্শের আলোচনা শিক্ষকগণের মুখে মুখে থাকবে। ক্লাসে ক্লাসে এগুলো আলোচিত হবে। শিক্ষার্থীদের আখলাক ও চিন্তাধারা গঠনে 'মাসিক চিন্তা সেমিনার'-এর আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে চিন্তার আদান-প্রদান করা হবে। যারা চিন্তাধারায় মযবূত, তারা সেখানে আলোচনা রাখবেন। আর তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ম যদি করতে হয়, আরবীতে কথা বলার নিয়ম যদি করতে হয়, ঢিলাঢালা সুন্নাতী পোশাকের নিয়ম যদি করতে হয়, তবে শিক্ষকের জন্য করতে হবে। কারণ শিক্ষকগণ যদি এগুলোতে অভ্যস্ত হোন তবে শিক্ষার্থীরা সেগুলো এমনিতেই নিজেদের মাঝে নিয়ে নিবে। এভাবে ধীরে ধীরে হয়ত আমরা একসময় আমাদের শুকনো ঠনঠনে পরিবেশের বুকে এক পশলা বৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আমরা আমাদের সবটুকু শ্রদ্ধা একত্রিত করে আমাদের শিক্ষকগণের প্রতি আবেদন রাখব, তারা যেন তাদের প্রতিটি পদচিহ্ন এমনভাবে রাখেন, যা নির্দ্বিধায় অনুসরণ করা যায়। তারা যেন শিক্ষার্থীদের জন্য হ'তে পারেন 'উসওয়াতুন হাসানাহ'। তাদের মাধ্যমে যেন শিক্ষার্থীদের তাক্বওয়া, সুন্নাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা, যোগ্য হওয়ার তীব্র বাসনা, দ্বীনের খিদমতে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার শক্ত মানসিকতার বীজ বপিত হয়। শিক্ষার্থীরা যেন ভালোবেসেই সব ভাল গুণগুলোকে নিজের মাঝে স্থান দেয়।

আমরা জানি, এই কাজ অনেক কঠিন। একটা পাহাড় বহন করে স্থানান্তর করার চেয়েও হয়ত কঠিন। কারণ নীতি-নৈতিকতা, আমল-আখলাক শুধু শিক্ষার্থীরাই হারায়নি। আমরাও হারিয়েছি। তাই আমাদের এখন থেকেই দো'আ এবং আত্মপরিচর্যা বাড়াতে হবে। একটি ব্যক্তিগত কাঠগড়া তৈরী করতে হবে। যে কাঠগড়ায় সকাল-সন্ধা নিজেকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। প্রতিনিয়ত কমিয়ে ফেলতে হবে ঐ কাজগুলো, যেগুলো আমার শিক্ষার্থীরা করলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রতিনিয়ত বাড়াতে হবে সুন্দর কথা, কাজ ও চিন্তার বীজ বপন। আজ থেকে যদি এগুলো বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারি, তবে কিছুদিন পরে হয়ত আমরাই হয়ে উঠব যোগ্য মালী।

এই কঠিন সফরে আমি সকল শিক্ষকের জন্য দো'আ করি। আর আমিও একজন শিক্ষক। তাই এই লেখার মাধ্যমে আমার সকল পাঠকের নিকটে আমিও খাছ দো'আ চাই, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন। আল্লাহ যেন আমাদের অন্তরের কথাগুলো আমাদের আমলের মাঝে মিশিয়ে দেন। যেমনভাবে দুধের সাথে চিনি মিশে গিয়ে দুধকে মিষ্টি করে তোলে। আমাদের আশাগুলো আমাদের পদচিহ্নের সাথে যেন এমনভাবে মিশে যায়, যেভাবে বৃষ্টির পানি তৃষ্ণার্ত মাটির সাথে মিশে নতুন প্রাণের জন্ম দেয়। আল্লাহ আমাদের সকলের সুন্দর প্রচেষ্টাগুলোকে কবূল করুন। আমীন।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আবুবকর ও ওমর (রা.)

-ড. নূরুল ইসলাম

এক সাধারণ মানুষের কাছে আবুবকর (রা.)-এর জবাবদিহিতা :

এক জুম'আর দিনে আবুবকর ছিদ্দীক (রা.) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আগামীকাল সকালে তোমরা ছাদাক্বার উটগুলো নিয়ে উপস্থিত হবে। আমরা সেগুলো বণ্টন করব। আর আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন ভেতরে প্রবেশ না করে। এক ব্যক্তি যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল তখন তাঁর স্ত্রী বলল, এই উটের লাগামটি নিয়ে যাও। হয়তো আল্লাহ আমাদের একটি উট দান করবেন। লোকটি লাগাম নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল, আবুবকর ও ওমর (রা.) উটগুলোর কাছে প্রবেশ করেছেন। সেও বিনা অনুমতিতে তাঁদের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আবুবকর (রা.) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমাদের অনুমতি ছাড়া কে ভেতরে ঢুকতে দিল'? এরপর তিনি লোকটির হাত থেকে লাগামটি নিয়ে সেটি দিয়েই তাকে আঘাত করলেন। উট বণ্টন শেষ হলে আবুবকর (রা.) সেই লোকটিকে ডেকে লাগামটি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এসো, তুমি আমার কাছ থেকে কিছাছ (প্রতিশোধ) গ্রহণ করো'। তখন ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! সে কিছাছ নেবে না। এটিকে মানুষের জন্য রেওয়াজে পরিণত করবেন না। তখন আবুবকর (রা.) বললেন, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে আমার দায় থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? ওমর (রা.) বললেন, তাকে সন্তুষ্ট করে দিন। অতঃপর আবুবকর (রা.) তাঁর খাদেমকে নির্দেশ দিলেন, যেন সে ঐ ব্যক্তির কাছে একটি সওয়ারীর উট, তার জিন, একটি মখমলের চাদর এবং পাঁচ দীনার পৌঁছে দেয়। এভাবে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করলেন।[১]

এই ঘটনায় আবুবকর (রা.)-এর অসাধারণ তাক্বওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং মানুষের হক আদায়ে তাঁর গভীর সতর্কতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

ব্যভিচারীর শাস্তি কার্যকর করলেন আবুবকর (রা.) :

আবুবকর ছিদ্দীক (রা.)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে এক কুমারী দাসীর সঙ্গে অবৈধ যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়ে তাকে গর্ভবতী করেছিল। পরে সে নিজেই ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি প্রদান করে। ইবনু মাছঊদ (রহঃ) বলেন, সে ব্যভিচার করেছিল এবং সে মুহসান (অর্থাৎ পূর্বে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিতকারী) ছিল না। তখন আবুবকর (রা.) তার ওপর শরী'আত নির্ধারিত ব্যভিচারের শাস্তি (একশ বেত্রাঘাত) কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এরপর তাকে ফাদাক অঞ্চলে নির্বাসিত (দেশান্তর) করা হয়।

বিচারের কাঠগড়ায় ওমর (রা.) :

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, ওমর (রা.) ও উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তখন ওমর (রা.) বললেন, 'আমাদের দু'জনের মাঝে ফায়ছালা করার জন্য একজন বিচারক নির্ধারণ করুন! তারা উভয়ে মিলে যায়েদ বিন ছাবিত (রা.)-কে তাদের বিচারক নিযুক্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা তাঁর (যায়েদের) কাছে গেলেন। ওমর (রা.) গিয়ে বললেন, 'আমরা তোমার কাছে এসেছি যেন তুমি আমাদের মাঝে বিচার কর। বর্ণনাকারী বলেন, তারা যখন যায়েদের ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন যায়েদ ওমর (রা.)-কে তাঁর বিছানার সামনের দিকে নিজের পাশে বসালেন। তখন ওমর (রা.) বললেন, هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ جُرْتَ فِي حُكْمِكَ، أَجْلِسْنِي وَخَصْمِي مَجْلِسًا 'তুমি তোমার বিচারকার্যে প্রথমেই অন্যায় করে ফেললে! তুমি আমাকে এবং আমার প্রতিপক্ষকে (ওবাই) একই আসনে বসাও (অর্থাৎ তুমি কেবল আমাকেই সম্মানের আসনে বসিয়ে অন্যায় করেছ)। এরপর তারা উভয়ে তাঁর কাছে ঘটনাটি খুলে বললেন। তখন যায়েদ (রা.) ওবাই-এর উদ্দেশে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীনের ওপর শপথ (হলফ) করা আবশ্যক। তবে আপনি চাইলে তাঁকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন'। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ওমর (রা.) সেই বিষয়টি নিয়ে শপথ করলেন। অতঃপর তিনি (যায়েদকে উদ্দেশ্য করে) শপথ করে বললেন, لَا تُدْرِكُ بَابَ الْقَضَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِي عِنْدَكَ عَلَى أَحَدٍ فَضِيلَةٌ 'তুমি ততক্ষণ প্রকৃত বিচারক হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার কাছে বিচারপ্রার্থী একজন সাধারণ মানুষ এবং আমার (আমীরুল মুমিনীনের) মাঝে কোন সম্মানজনক পার্থক্যের স্থান না থাকে'।[২]

আনাস (রা.)-কে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করলেন ওমর (রা.) :

হযরত ওমর (রা.) জনস্বার্থকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি আনাস বিন মালেক (রা.)-কে শাস্তি দিয়েছিলেন। কারণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ৬ হাযার দিরহাম তাঁর কাছে আমানত হিসাবে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণে অবহেলা করেছিলেন। ফলে ওমর (রা.) তাঁকে সেই অর্থের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেন। ঘটনাটির প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায়, ওমর (রা.) আনাস (রা.)-এর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনেননি; বরং অর্থ সংরক্ষণে তাঁর অবহেলাই এর কারণ বলে মনে করেছিলেন।[৩] আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, 'আমার কাছে ৬ হাযার দিরহাম আমানত রাখা হয়েছিল। পরে তা হারিয়ে যায়। তখন ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর সঙ্গে তোমার নিজের কোন সম্পদও কি হারিয়েছে?' আমি বললাম, 'না'। তখন তিনি আমাকে সেই অর্থের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করলেন'।[৪]

উক্ত ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের ন্যায়বিচারের আদালতে ধনী-দরিদ্র, শাসক-প্রজা ও সাধারণ-অসাধারণ সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। আবুবকর ও ওমর (রা.) তাদের শাসনামলে সেই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করে ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

---

১. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৮/৮৯; সুয়ূতী, জাম'উল জাওয়ামে ১৪/১৯৯।*

২. *আস-সুনানুল কুবরা, ১০/২৪৩; ক্রমিক : ২০৫১; ওয়াকী, আখবারুল কুযাত ১/১০৮-১০৯।*

৩. *আকরাম যিয়া আল-উমারী, আছরুল খিলাফাতির রাশিদাহ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল উবাইকান, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২৬।*

৪. *আবু বকর আল-জাছছাছ, আহকামুল কুরআন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ২/২৬০।*

মানুষ

*-মুস্তাফীযুর রহমান**

॥ এক ॥

চৌধুরী ছাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। সুন্দর চেহারা, মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে অভ্যস্ত তিনি। সমাজে জনসেবক হিসাবে বেশ নামডাক আছে। সেদিন সোমবার। আছরের ছালাতের পর চৌধুরী ছাহেবের বাড়ীতে গিয়ে হাযির হ'লাম। ভদ্রলোক বৈঠকখানায় বসে তাসবীহ পাঠ করছিলেন। আমাকে দেখে ভারি খুশী হ'লেন।

হাঁক ডাক ছাড়লেন, কুলছূম! এই কুলছূম, জলদি আয়! একটু পর বছর সাতেক বয়সের একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। মেয়েটির পরনে অনেকগুলো তালি দেওয়া পুরনো কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ আর উস্কখুস্ক। কিন্তু এই মলিন রূপের আড়ালেও তার গায়ের রং ও চেহারাখানি ভারি মায়াবী। চৌধুরী ছাহেব ধমক দিয়ে বললেন, হা করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? সালাম কর! উনি আমার বন্ধু, চাচা বলে ডাকবি, বুঝলি?

কুলছূম ভয়ার্ত চোখে 'জ্বী' বলে কদমবুচি করতে এল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, কদমবুচি করতে নেই মা, সালাম দেওয়াই যথেষ্ট।

চৌধুরী ছাহেব আবার ধমকালেন, যা, ভেতর থেকে কিছু নাশতা নিয়ে আয়। মেয়েটি মাথা নিচু করে ভেতরে চলে গেল। আমার মনটা ব্যথায় ভারি হয়ে উঠল। বললাম, মেয়েটাকে অন্তত একটু ভালো কাপড়-চোপড় পরালেই তো পারেন! ওকে কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছেন নাকি?

চৌধুরী ছাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, না ভাই, এমনিতেই এসে জুটেছে। ওর মায়ের সাথে পাশের পীর ছাহেবের বাড়ীতে থাকত। মুরীদরা এসে কুলছূমকে কোলে নিয়ে খুব আদর-সোহাগ করত, বলত হুজুরের মতো চেহারা পেয়েছে। এই জ্বালা সইতে না পেরে পীরের স্ত্রী ওদের বের করে দেয়। পরে ওর মা করোনায় মরে গেল। সেই থেকেই ও আমার এখানে।

॥ দুই ॥

আরেক দিন মাগরিবের ছালাত পড়ে আমরা কয়েকজন বৈঠকখানায় বসে গল্পে মশগূল। চৌধুরী ছাহেব চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাসবীহ জপছেন। এমন সময় অন্দরমহল থেকে ভেসে এল সপাসপ বেত্রাঘাতের শব্দ আর এক করুণ আর্তনাদ। চিনতে পারলাম, এ কুলছূমের গলা।

ভেতর থেকে বিবি ছাহেবের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কানে ভেসে এল, হারামজাদী! চোরের হদ্দ! ছয়টা মোরব্বার মধ্যে একটা তুই চুরি করে গিললি? সেজন্যই তো আমার ছেলে-মেয়ের ভাগে কম পড়ল! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! আমরা থমকে গেলাম, কিন্তু চৌধুরী ছাহেব নির্বিকার। তাসবীহ পড়া শেষ করে তিনি অত্যন্ত শান্ত পায়ে ভেতরে গেলেন। একটু পর ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন, কিছু না ভাই। বাড়ীতে ঐ যে একটা 'মানুষ' আছে না– ঐ যে হারামজাদী কুলছূম! চোর একটা, মোরব্বা চুরি করে খেয়েছে। তাই বিবি ছাহেব একটু শাসন করছেন। আর ওকেই বা কি দোষ দিব? ওর মা-ইতো ছিল একটা হারামজাদী। সেই চুরি করে খাইয়ে মেয়ের জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য বন্ধুরা তখন সায় দিয়ে বলে উঠল, ঠিকই তো, ছোটলোকের জাতই চোর!

কিন্তু আমি পরে আসল ঘটনাটি জানতে পেরেছিলাম। কুলছূম নিজের জন্য মোরব্বা চুরি করেনি। চৌধুরী ছাহেবের তিন বছরের ছেলে খোকা নিজে অর্ধেকটা খেয়ে বাকীটা ভালোবেসে কুলছূমের মুখে গুঁজে দিয়েছিল। বিবি ছাহেব দূর থেকে সেটা দেখেই ভুল বোঝেন। কুলছূম একটিবারও খোকার নাম মুখে নেয়নি, পাছে বিবি ছাহেব নিজের ছেলেকেও বকা দেন! মার খাওয়ার পর রাতে যখন কুলছূম ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, ছোট্ট খোকা চুপিচুপি এসে তার আধো আধো বোলে কুলছূমের চোখের পানি মুছে দিয়েছিল।

আমি ভাবতাম, নিজেদের সন্তানদের জন্য হিসাব করে মোরব্বা ও সন্দেশ থাকলেও এই বয়সের ইয়াতীম কুলছূমদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকে না কেন? আল্লাহ সবার মুখে সমান জিভ দিয়েছেন, অথচ এই চৌধুরী ছাহেবরা এত নিষ্ঠুর হয় কি করে!

॥ তিন ॥

আরেক দিনের ঘটনা। চা-নাশতা শেষে চৌধুরী বাড়ী থেকে উঠব উঠব করছি। এমন সময় অন্দরমহল থেকে আবার সেই সপাসপ শব্দ আর কুলছূমের আর্তনাদ। সঙ্গে বিবি ছাহেবের গর্জন– হারামজাদী! তুই জাদু করছিস, নইলে আমার পেটের ছেলে আমারই পর হয়ে যায়?

কুলছূমের অপরাধ ছিল তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। খোকার জন্মের পর থেকে তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে কুলছূম। তার পেশাব-পায়খানা পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে তাকে ঘুম পাড়ানো–সবই সে করত। বিবি ছাহেবের হুকুম ছিল, কুলছূম খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে খোকাকে তাঁর বুকে দিয়ে আসবে। কিন্তু মুশকিল হ'ল, মাঝরাতে খোকার ঘুম ভাঙলেই সে মায়ের বদলে কুলছূমের কোলে যাওয়ার জন্য চিৎকার জুড়ে দিত। নিজের ছেলের এই টান বিবি ছাহেবের সহ্য হ'ত না। আর তার সব রাগ গিয়ে পড়ত ঐ ইয়াতীম মেয়েটার ওপর। বিবি ছাহেব কুলছূমকে তাদের 'চাকরানি' বা নিচু জাতের মানুষ ভাবলেও খোকা সেই কৃত্রিম বিভেদ মানতে চাইত না। সে মায়ের দামী আচলের চেয়ে কুলছূমের ছেঁড়া আচলের গন্ধেই বেশী শান্তি পেত।

এমনি করে পাঁচ বছর কেটে গেল। অন্দরে কুলছূমের আর্তনাদ এখন সবার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কুলছূম এখন অনেক বড় হয়েছে। একদিন তাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ মা? জবাব দেওয়ার পরিবর্তে তার দুই চোখ অশ্রুতে টলমল করছে। সে তাড়াতাড়ি তার পরনের ছেঁড়া ওড়না দিয়ে হাতের একটা পোড়া দাগ ঢাকার চেষ্টা করল। কোন শব্দ না করে শুধু চোখ মুছতে মুছতে ভেতরে চলে গেল। তার সেই নীরব কান্না আমাকে বুঝিয়ে দিল, এই পাঁচ বছরে তার কষ্টের কোন উপশম হয়নি।

*গাবতলী, বগুড়া।

॥ চার ॥

কয়েক দিন পরের ঘটনা। গভীর রাতে হঠাৎ গ্রামের নিস্তব্ধতা ভেঙে চারিদিক থেকে চিৎকার ভেসে এল- আগুন! আগুন! চৌধুরী বাড়ীতে আগুন! আমি ধরফর করে বিছানা থেকে উঠে দৌড়ালাম। গিয়ে দেখি, চৌধুরী ছাহেবের সাজানো গোছানো বিশাল অন্দরমহল দাউদাউ করে জ্বলছে। চারিদিকে প্রচণ্ড ধোঁয়া আর মানুষের হাহাকার। চৌধুরী ছাহেব তখন উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন, তাঁর একহাতে টাকার সিন্দুক আর অন্যহাতে কিছু দলিলপত্র। বিবি ছাহেবও কোনমতে গা বাঁচিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছাড়ছেন। আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, টাকাকড়ি কিছু বাঁচানো গেল?

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, ঘরগুলোই যা পুড়ল ভাই! তবে সময় থাকতে গোয়ালঘরের গরু-বাছুরগুলোর দড়ি কেটে দিতে পেরেছিলাম। টাকার সিন্দুকটাও বের বের করতে পেরেছি। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিবি ছাহেবের সম্বিত ফিরল। নিজের শূন্য কোলের দিকে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ওগো! আমার খোকা কই? খোকা তো ভেতরে ঘুমাচ্ছিল!

মুহূর্তের মধ্যে পুরো উঠোন স্তব্ধ হয়ে গেল। আগুনের উত্তাপ তখন এতটাই তীব্র যে ভেতরে ঢোকার সাহস কারও নেই। ঠিক সেই সময়, ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে পেছনের দিক থেকে ছুটে এল কুলছুম। বিবি ছাহেবের আর্তনাদ শুনে সে থমকে দাঁড়াল। কুলছুমের চোখে কোন দ্বিধা দেখা গেল না। বিবি ছাহেবের দিকে তাকিয়ে শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, ভয় পাইয়েন না আম্মা, আমি খোকা ভাইরে লইয়া আসতাছি।

না রে মা, যাস না! পুড়ে মরবি! বিবি ছাহেবের মুখ থেকে এবার আর 'হারামজাদী' বা 'চোর' শব্দ বের হ'ল না, এক চরম অপরাধবোধ আর মাতৃস্নেহ থেকে 'মা' ডাকটা বেরিয়ে এল। কিন্তু কুলছুম ততক্ষণে জ্বলন্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বাইরে আমরা সবাই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ অন্দরের জ্বলন্ত জানালার পর্দা ছিঁড়ে উঠোনে এসে পড়ল কাপড়ে জড়ানো একটি পুঁটলি। আমরা সবাই ছুটে গেলাম। কাপড়ের বাঁধন খুলতেই দেখা গেল, খোকা দিব্যি বেঁচে আছে! কুলছুম নিজের গায়ের ভেজা কাপড় দিয়ে খোকাকে এমনভাবে জড়িয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল যে, আগুনের একটা আঁচও তার গায়ে লাগেনি।

কিন্তু খোকাকে ছিটকে ফেলার ঠিক পরের মুহূর্তেই, এক বিকট শব্দে জ্বলন্ত ছাদটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে কুলছুম দাঁড়িয়ে ছিল। একটা আর্তনাদ করার সুযোগও পেল না মেয়েটি।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন সকালে আগুন পুরোপুরি নিভে গেছে। চারিদিকে শুধু কালো ছাই আর কয়লা। চৌধুরী ছাহেব তখনো পুড়ে যাওয়া ঘরের এক কোণে তাঁর বেঁচে যাওয়া টাকার হিসাব করছেন। কিন্তু বিবি ছাহেব সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। তিনি খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে যেখানে ছাদ ভেঙে পড়েছিল, সেই ছাইয়ের স্তূপের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। বিবি ছাহেব দুই হাতে সেই তপ্ত ছাই মুঠো করে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, আমি ওরে এক টুকরো মোরব্বা চুরির অপবাদে পশুর মতো পিটিয়েছি...। আর ও নিজের কলিজা দিয়ে আমার মানিকরে ফিরায়ে দিল! হায় আল্লাহ, আমি কারে ছোটলোক ভাবলাম, আর কারে মানুষ ভাবলাম! এই পাপ আমি কই রাখব?

তাঁর চোখের পানি তপ্ত ছাইয়ের ওপর পড়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমার দু'চোখ দিয়েও অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল। চৌধুরী ছাহেবের ঐ কয়লা হয়ে যাওয়া আলিশান বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, বাহ্যিক রূপ আর বিত্ত-বৈভবে মোড়ানো এই প্রাসাদে সত্যি বলতে ওই একটি মেয়েই প্রকৃত 'মানুষ' ছিল।

শিক্ষণীয় :

১. অনেক বিত্তশালী মানুষের বাহ্যিক দ্বীনদারীর আড়ালে তাদের নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে থাকে। বাইরের পৃথিবীতে তার দান-ছাদাক্বা কেবলই আত্মপ্রচারণা বৈ কিছুই নয়।

২. ইয়াতীম ও অসহায় শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা এবং নিজ সন্তান ও আশ্রিত সন্তানের মাঝে বৈষম্য করা চরম অমানবিকতা ও বড় ধরনের পাপ।

৩. কেবল জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। মাতৃত্ব হ'ল নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও ভালোবাসার নাম।

৪. ছোটরা তাদেরকেই পসন্দ করে, যারা তাদের বেশী ভালোবাসা দিতে পারে।

৫. চরম বিপদের মুহূর্তে মানুষের সঞ্চিত ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা বা বিত্তবৈভব কোন কাজে আসে না; বরং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও মানবিকতাই মানুষের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়।

৬. প্রকৃত মনুষ্যত্ব পোষাক, বংশমর্যাদা বা সম্পদের মাঝে নিহিত নয়; বরং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও অন্যের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই তা নিহিত।

৭. আমরা যাদেরকে অবহেলা বা অপসন্দ করি অনেক সময় আল্লাহ তার অসীলাতেই আমাদেরকে বড় কোন বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারেন।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

টুথব্রাশ ব্যবহারে অসাবধানতায় হ'তে পারে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস

অনেকেই পুরনো টুথব্রাশ মাসের পর মাস ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতই অন্যের টুথব্রাশ ব্যবহার করেন! এই সামান্য অবহেলাই ডেকে আনতে পারে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মতো ভয়ংকর সমস্যা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, টুথব্রাশ হ'ল শরীরকে সংক্রমণ ও রোগ থেকে রক্ষা করার প্রথম সারির রক্ষাকবচ। চিকিৎসকদের মতে, মানুষের মুখে থাকে প্রায় ৭০০ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া। নিয়মিত দাঁত না মাজলে এসব ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে প্লাক তৈরি করে, যা মাড়ির প্রদাহের মূল কারণ। চিকিৎসকরা সতর্ক করে বলেন, এই ব্যাকটেরিয়া ও প্রদাহজনক অণুগুলো রক্তপ্রবাহে ঢুকে গেলে তা হৃদয়, লিভার ও অগ্ন্যাশয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ সৃষ্টি করে।

ডায়াবেটিসের সঙ্গে মুখের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক : ২০২০ সালে প্রকাশিত ডায়াবেটোলজিয়া জার্নালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা দিনে অন্তত তিনবার বা তার বেশী দাঁত ব্রাশ করেন তাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি, যারা দিনে মাত্র একবার বা একবারও ব্রাশ করেন না তাদের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ কম।[১] এর পেছনের অন্যতম কারণ হ'ল ডায়বেটিসে আক্রান্তদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকে। ফলে মুখে সংক্রমণ হ'লে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ইনসুলিন হরমোনের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলতে পারে। ইনসুলিনই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই দাঁতের যত্ন না নিলে ডায়াবেটিস আরও জটিল হ'তে পারে।

মাড়ির প্রদাহ বাড়ায় হৃদরোগের ঝুঁকি : মাড়ির দীর্ঘস্থায়ী ইনফ্লামেশন শুধু রক্তপাত ঘটায় না, বরং ধমনীগুলোকেও শক্ত করে ফেলে। যাকে বলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত চিকিৎসাব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনস হপকিন্স মেডিসিন জানায়, এটি ধমনীর ভেতরে প্লাক জমে যাওয়ার ফলে হয়, যা হার্টঅ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। দীর্ঘদিন মুখের প্রদাহ চলতে থাকলে হৃদয়ের প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। যাদের অনিয়ন্ত্রিত মাড়ির রোগ আছে, তাদের হার্ট ডিজিজের আশঙ্কা প্রায় দ্বিগুণ।

সুস্থ থাকতে করণীয় :

১. দিনে দুইবার দাঁত মাজুন : প্রতিদিন কমপক্ষে দুইবার, সকালে খাওয়ার পর এবং ঘুমানোর পূর্বে ভালোভাবে দাঁত মাজুন। এসময় আঙুল বা ব্রাশ দিয়ে জিহবা পরিষ্কার ও মাড়িতে আলতোভাবে ম্যাসাজ করে নিতে হবে। এছাড়া প্রতিবার ছালাতে ওযূ করার সময় মেসওয়াক করতে পারেন। নিয়মিত ব্রাশ করলে শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকে।

২. নিয়মিত ফ্লস করুন : যাদের দাঁতের ফাঁকে খাবার আটকে থাকে, তাদের ডেন্টাল ফ্লস বা ইন্টার ডেন্টাল ব্রাশে অভ্যস্ত হ'তে হবে। দাঁতের ভেতরের পৃষ্ঠে পাথর এবং চর্বণে ব্যবহৃত পৃষ্ঠ ও দুই দাঁতের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠে ক্ষয় বেশী হয়। কারণ এসব স্থান পর্যাপ্ত পরিষ্কার হয় না।

৩. বছরে অন্তত দুইবার ডেন্টাল চেকআপ করুন : দাঁতের যত্নে সবচেয়ে বড় সাবধানতা হ'ল- কোন সমস্যাকে অবহেলা না করা। দাঁতে সামান্য শিরশির অনুভূতি, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া বা হালকা ব্যথা যেকোন লক্ষণ দেখা দিলেই অবহেলা না করে বিশেষজ্ঞ ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। কোন দৃশ্যমান সমস্যা না থাকলেও প্রতি ছয় মাসে একবার ডেন্টাল চেক-আপ করানো উচিত। এতে করে সমস্যা বড় আকার ধারণ করার আগেই তা সমাধান করা সম্ভব হয়।

৪. সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন : দাঁতের সুস্থতার জন্য সুষম খাদ্যের গুরুত্ব অনেক। কারণ এটি দাঁত ও মাড়িকে শক্তিশালী করে এবং গহ্বর (Cavity) ও অন্যান্য সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন ডি, ভিটামিন সি এবং ফ্লোরাইড জাতীয় পুষ্টি উপাদান দাঁতের এনামেল মযবূত করতে অপরিহার্য। যা খাদ্যের মাধ্যমেই পূরণ হয়। এছাড়াও দৈনন্দিন প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

কতদিন পর টুথব্রাশ বদলাবেন : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতি তিন মাসে একবার টুথব্রাশ পরিবর্তন করা উচিত। কারণ পুরনো টুথব্রাশে জীবাণু জমে যায় এবং এর ব্রিসল বা আঁশ বাঁকিয়ে যায়। ফলে তা দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা প্লাক বা ব্যাকটেরিয়া পুরোপুরি তুলতে পারে না।

ব্রাশের যত্নে বাড়তি সতর্কতা : ব্যবহারের পর টুথব্রাশ খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরার জন্য সবসময় সোজা বা খাড়া করে রাখুন। অন্য ব্রাশের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবেন না, খোলা বাতাসে শুকাতে দিন। পাশাপাশি ভেতরে জমে থাকা অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস করতে সপ্তাহে অন্তত এক দিন গরম পানি দিয়ে ব্রাশ পরিষ্কার করতে হবে।

যে খাবারগুলো পরিহার করতে হবে : চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাদ্য মুখের স্বাস্থ্যকে যেমন হুমকিতে ফেলে, তেমনি রোগ প্রতিরোধক্ষমতাও হ্রাস করে। ছোটবেলা থেকে চিনির প্রতি দুর্বলতা কমাতে শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। ধূমপান, জর্দা, গুল প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্য দাঁতের সুস্থতার জন্য বিপজ্জনক। এছাড়াও অতিরিক্ত টকজাতীয় খাবার, যেমন লেবু, তেঁতুল ও ক্যান্ডি দাঁতের সংস্পর্শে যত কম রাখা যায়, ততই ভালো।

শেষ কথা : নিয়মিত ও সঠিক সময়ে দাঁত মাজা শুধু মুখের নয়, পুরো শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য যরূরী। দাঁতের অযত্নে আমরা যে রোগ ও ভোগান্তিগুলোতে ভোগী তা খুবই কষ্টকর। তাই ছোট এই অভ্যাসটাই ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ দাঁতের নানা জটিলতা থেকে সুরক্ষা পেতে সাহায্য করতে পারে।

১. *জাগো নিউজ অনলাইন, https://surl.li/uuuidl*।

Khalisun Products
খলিসুন প্রোডাক্টস
বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত

বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
ভাজা জিরা গুড়া-১৫০০ Tk/Kg
হোম মেড
পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
রং ও কেমিক্যাল মুক্ত
দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
১০০% খাঁটি ও অথেন্টিক
ধনিয়া/জিরা ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা
গরম মসলা গুড়া
শাহী গরম মসলা গুড়া
বি: দ্র: অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।
SCAN ME
বিসিক নিবন্ধন নং : RA-20251109-0022719
যোগাযোগ : (ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৪৮ Khalisun Products

কবিতা

কাদা নয়, কাঁধে কাঁধ

-আবূ রায়হান, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

ওরে মূঢ় ভাই, কেন আজ এই কাদা ছোড়াছুড়ি খেলা!
বিদ্বেষ-বিষ বুকে তুলে নিয়ে কেন এই অবহেলা!
কাদা ছুড়ে যদি কর কলুষিত নিজ ভাইয়ের দেহ
তোমারও হাতে লেগে যাবে দাগ ঘুচাবে না তা কেহ।
শোনো হে নবীন, তরুণের দল! ছিঁড়ে ফেল হীন পাশ
এসো এক হয়ে কাঁধে কাঁধ রেখে গড়ি সুন্দর আবাস।
কাদা মেখে ভাই লভিবে কি ফল, মিছে এই ক্ষোভ যেদ,
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দাও, ভুলে যাও ভেদাভেদ!
আকাশের চাঁদ ছিনিয়ে আনতে চালাও অভিযান।
উদারতা ও সহিষ্ণুতার বর্ম পরে হও আগুয়ান।
পিছনের গ্লানি ভুলে গিয়ে আজ গাও সাম্যের গান,
মহীয়ান হয়ে জাগো এক সাথে হে কামেল ইনসান!
সহযোগিতার মন্ত্রে জাগাও অন্তরে নব জোর,
কাদামাটি নয়, ফুটাব গোলাপ আসিবে নতুন ভোর!
কাদা ছোড়াছুড়ি নয়, রাখি হাতে হাত গড়তে এ সমাজ
জাতি গঠনে ঐক্য হয়ে সবে মিলে করি কাজ।
বিভেদ ভুলিয়া এক সাথে চল, কর দৃপ্ত পণ,
কাদা মেখে নয়, প্রেম দিয়ে জয় করব সবার মন!

বিচারের পাল্লা

-মুহাম্মাদ রিযওয়ানুল হক
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

বড়দের অপরাধ লঘু হয়ে যায়,
ছোটদের ভুলগুলো পাহাড় বানায়।
একই অপরাধে কেন ভিন্ন বিচার?
কোথায় ন্যায়-নীতি ইনছাফ সুবিচার?
নেতারা সহজে আজ পেয়ে যান ছাড়,
কর্মীরা বয়ে চলে শাস্তির ভার।
ক্ষমতার ছায়া যার মাথার উপর,
নিরাপদ থাকে তার আপন সে ঘর।
নত হয়ে ছোটরাই করে সমঝোতা,
ত্যাগের খাতায় লেখে জীবনের কথা।
বিচারের পাল্লাটি টলে যায় যবে,
সমতা ও সুবিচার উড়ে যায় তবে।
ক্ষমতাবানরা শুধু সুযোগটি পায়,
দুর্বলেরা বারবার শুধু হেরে যায়।
ন্যায়ের সুপথে হোক অটল সবাই,
দ্বিমুখী নীতির কোন স্থান নাই।
একই সে অপরাধে একই বিচার,
এটাই তো দাবী আজ কুল মানবতার।

স্টেশন

-মুবাশশির সা'দ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

স্টেশনে বসে ভাবি যাত্রার শুরু ও শেষ
নবজাতকের ক্রন্দন, বৃদ্ধের কেশ।
জীবনের স্টেশনে মানুষ রেলগাড়ী
এইতো এসে থামে আবার যায় ছাড়ি।
মাঝে শুধু কিছু স্মৃতি কিছু কোলাহল
কিছু রূযী আর সঞ্চিত কিছু আমল।
ধীরে ধীরে যবে পৌঁছে মৃত্যুর বন্দরে
রূহ ছেড়ে দেহ তার পড়ে থাকে গোরে।
এক চোখে দেখি কত তরুণেরা হাসে
ভিন্ চোখে দেখি কাতরায় মৃত্যুশ্বাসে।
দেখি কত রেল যায় কত রেল আসে
কিছু ধুম্র আবহ রেখে যায় বাতাসে।
যদি অম্লান হ'তে চাও গোরে ও ভবে
আগে আমলের প্রতি মন দাও তবে।

দারুল আবরার লাইব্রেরী

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাফসীর পাবলিকেশন'-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

ATAB MEMBER | Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

স্বদেশ

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপযেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপযেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত ২৬ জুলাই এক পরিপত্রের মাধ্যমে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশটি জারী করেন উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুম্পা ঘোষ। এর মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানো এবং শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পরিপত্রে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের মাঝে মোবাইল আসক্তি উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এটি তাদের পড়াশোনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই সুন্দর ভবিষ্যতের স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পাঠদানে মনোযোগ ধরে রাখতে ক্লাস চলাকালীন শিক্ষকদেরও মোবাইল ফোন ব্যবহারে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঢাকার আদালতপাড়ায় ভাড়ায় মেলে আসামী

রাজধানীর ঢাকার আদালতপাড়ায় টাকার বিনিময়ে প্রকৃত আসামীর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে আদালতে আত্মসমর্পণ করানোর এক চাঞ্চল্যকর জালিয়াতির ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। উত্তরা-পূর্ব থানার একটি প্রতারণা মামলায় এক নারী আসামীর পরিবর্তে তার এক আত্মীয় অর্থের বিনিময়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করে কারাগারে যান। পরে জামিন শুনানীর সময় বাদীপক্ষের আপত্তির পর বিষয়টি আদালতের নযরে আসে। আদালতের নির্দেশে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে। ঘটনার পর আদালত এ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আদালতপাড়াকে কেন্দ্র করে একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের প্রতারণা চালিয়ে আসছে। আদালতের আশপাশের কয়েকটি ফটোকপির দোকানকে কেন্দ্র করে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অভিযোগ রয়েছে আদালতের কিছু অসাধু কর্মচারীর সহযোগিতায় বিচারকের স্বাক্ষর, সীল ও স্মারক নম্বর ব্যবহার করে জাল নথিপত্র তৈরি করে এ চক্রটি প্রতারণা করে থাকে।

আন্তর্জাতিক জার্নালে জালিয়াতি : বাংলাদেশী গবেষকদের ৩২৫টি গবেষণাপত্র বাতিল

সম্প্রতি জালিয়াতি, চৌর্যবৃত্তি (পেজিয়ারিজম), ভুয়া বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন ও তথ্যের অসংগতির অভিযোগে বিভিন্ন স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক জার্নাল থেকে বাংলাদেশী গবেষকদের অন্তত ৩২৫টি গবেষণাপত্র বাতিল করা হয়েছে। যা বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গবেষকদের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে এসব গবেষণাপত্র বাতিল করা হয়। বাতিল হওয়া এসব গবেষণাপত্রের সাথে দেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এর মধ্যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ৪৪টি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ৪২টি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২টি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০টি গবেষণাপত্র রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থাগুলোর তদন্তে উঠে এসেছে যে পদোন্নতি, প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক প্রণোদনা এবং অনৈতিক সুবিধার লোভে অনেক গবেষক কাল্পনিক উপাত্ত ব্যবহার, অর্থের বিনিময়ে লেখকস্বত্ব কেনাবেচা এবং গবেষণায় ভুয়া তথ্য যুক্ত করেছেন। এমনকি বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিং বাড়াতে সঊদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সুবিধার লোভেও অনেকে মানহীন গবেষণা প্রকাশ করেছেন। এই গুরুতর অনিয়মের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, অভিযুক্ত শিক্ষক বা গবেষকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রথমত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। আর তারা ব্যর্থ হ'লে ইউজিসি সরাসরি তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিশ্বে খেলাপি ঋণে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের পর বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণের দেশ বাংলাদেশ। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে জানা যায়, দেশের ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই (৩২.২৬ শতাংশ) এখন খেলাপি। বৈশ্বিক তালিকায় ৩৭.৩৫ শতাংশ খেলাপি ঋণ নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ইউক্রেন। এরপরই বাংলাদেশের অবস্থান। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় এই হার ৬ থেকে ১৫ গুণ বেশী হওয়ায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের হার এখন সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, দেশের ব্যাংক খাতে মোট ঋণের পরিমাণ ১৮ লাখ ২৫ হাযার কোটি টাকা। এর মধ্যে মার্চ'২৬ পর্যন্ত তিন মাসেই খেলাপি ঋণ ৩১ হাযার কোটি টাকার বেশী বেড়ে বর্তমানে মোট ৫ লাখ ৮৯ হাযার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া পুনঃতফসিল করা ঋণ ও স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্টস যুক্ত করলে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ লাখ ২০ হাযার কোটি টাকায়, যা মোট ঋণের প্রায় ৬১ শতাংশ। ব্যাংকার ও বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ঋণ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবই এর প্রধান কারণ।

দেশের অর্ধেকের বেশী কৃষকের বছরে আয় ৩৪ হাযার টাকারও কম

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারীদের আয় ও উৎপাদনশীলতা জরিপ ২০২৫'-এর তথ্যমতে, দেশের মোট কৃষকের ৫৩.৬৫ শতাংশই ক্ষুদ্র কৃষক। তাদের বার্ষিক গড় আয় মাত্র ৩৩ হাযার ৬৩৯ টাকা। অন্যদিকে বৃহৎ কৃষকদের গড় আয় ১ লাখ ২৯ হাযার ৯৫৬ টাকা। দেশের আটটি বিভাগের ১২ হাযার ৮৭৯টি পরিবারের ওপর পরিচালিত এই জরিপে দেখা যায়, জমির পরিমাণ, গবাদিপশুর সংখ্যা ও কৃষি আয়ের ভিত্তিতে চিহ্নিত নিচের ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র উৎপাদকের গড় জমির পরিমাণ মাত্র ৩৩.৫ শতাংশ, যেখানে বড় কৃষকদের রয়েছে ১২৩.৫ শতাংশ। ফলে জাতীয় গড় আয়ের হিসাব মূলত ক্ষুদ্র কৃষকদের বাস্তব আর্থিক দৈন্যকে আড়াল করে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, বাজার ব্যবস্থার সিন্ডিকেট এবং স্বল্প আয়ের কারণে ক্ষুদ্র কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে ও নতুন বিনিয়োগে পিছিয়ে পড়ছেন। ফলে অনেকেই কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশায় ঝুঁকছেন। কৃষকদের এই আয় বৈষম্য দূর করে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা না হ'লে ভবিষ্যতে দেশের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিদেশ

ইউরোপে তাপপ্রবাহে এক সপ্তাহে ১৬ হাযার মৃত্যু, তবু এসি ব্যবহারে রাযী নন অধিকাংশ ইউরোপীয়

ইউরোপে সাম্প্রতিক ভয়াবহ তাপদাহে মাত্র এক সপ্তাহে ১৬

হাযারের বেশী মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হ'লেও এসি ব্যবহারে চরম অনীহা দেখাচ্ছেন স্থানীয়রা। জুনের শেষদিকে বেলজিয়ামের দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেলে গত ২৮ জুন একদিনেই ৩১৩ জনের মৃত্যু হয়, যা করোনা মহামারির রেকর্ডকেও হার মানিয়েছে। অতিরিক্ত রোগীর চাপে হাসপাতালগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না এবং মৃতদের ৮৫ শতাংশেরই বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে। এত বিপুল প্রাণহানির পরও এসি ব্যবহারের প্রতি ইউরোপীয়দের নেতিবাচক মনোভাব বদলায়নি। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়ীতে এসি রয়েছে, সেখানে ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশগুলোতে এসি ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র ৪-৬ শতাংশ। ইউরোপীয়দের বদ্ধমূল ধারণা, এসি ব্যবহারে অসুস্থতা ও জীবাণু ছড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশের চরম ক্ষতি হয়। এছাড়া ব্যাপকভাবে এসি ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক চাপ পড়বে এবং নির্গত গরম বাতাসে শহরগুলো উল্টো আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এ কারণে সরকারী কর্তৃপক্ষও এসির বিকল্প হিসাবে পরিবেশবান্ধব আবাসন সংস্কার ও বিশেষ 'কুলিং স্পেস' তৈরির ওপর বেশী জোর দিচ্ছে।

মরুভূমির বিস্তার রোধে সরকারীভাবে ৬৬০০ কোটি গাছ লাগিয়েছে চীন

চীনের গোবি ও তাকলামাকান মরুভূমির বিস্তার রোধে ১৯৭৮ সাল থেকে 'সবুজ মহাপ্রাচীর' প্রকল্পের আওতায় ৬৬ বিলিয়ন অর্থ্যাৎ ৬ হাযার ৬০০ কোটিরও বেশী গাছ রোপণ করেছে চীন সরকার। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, রোপণকৃত এই গাছগুলো প্রাকৃতিক বনের গাছের তুলনায় ৬৬ শতাংশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০৫০ সালের মধ্যে আরও ৩৪ বিলিয়ন গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে চীনা কর্তৃপক্ষের। বিজ্ঞানীদের মতে, ইউক্যালিপটাস বা পপলারের মতো দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির ব্যবহার এবং মানুষের নিয়মিত পরিচর্যার কারণে গাছগুলোকে আলো, বাতাস ও পানির জন্য লড়াই করতে হয় না। ফলে এগুলো দ্রুত বেড়ে উঠছে। তবে গবেষকরা জানিয়েছেন, স্বল্পমেয়াদী কার্বন শোষণের জন্য রোপিত এই বন শক্তিশালী হাতিয়ার হ'লেও দীর্ঘমেয়াদী কার্বন সঞ্চয় ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রাকৃতিক বনের কোন বিকল্প নেই।

বিয়েতে মাকে দাওয়াত না দেওয়ায় চাকরী গেল ছেলের, চাকরী পেলেন মা

চীনের হেনান প্রদেশে নিজের বিয়েতে জন্মদাত্রী মাকে আমন্ত্রণ না জানানোয় এক কর্মীকে বরখাস্ত করেছেন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্রেন প্রস্তুতকারী ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান চুই পেইজুন কর্মীর বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেন বরের বৃদ্ধা মা আয়োজনে নেই। তিনি কারখানার পাশে একা বসে আছেন। কর্মীর কাছে কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, মায়ের সাধারণ চেহারা অতিথিদের সামনে তাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে ভেবেই তিনি মাকে আমন্ত্রণ জানাননি। শৈশবে বাবা মারা যাওয়ার পর যে মা একাকী হাড়ভাঙা খাটুনি করে ছেলেকে মানুষ করেছেন, তার প্রতি এমন চরম অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানপ্রধান তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বরখাস্ত করেন। ঐ কর্মী পরে ক্ষমা চাইলেও তিনি সিদ্ধান্ত বদলাননি। বরং সাফ জানিয়ে দেন, 'যে ব্যক্তি জন্মদাত্রী মাকে সম্মান দিতে পারে না, প্রতিষ্ঠানে তার কোন স্থান নেই'। উল্টো ঐ বৃদ্ধা মায়ের আর্থিক সুরক্ষার জন্য তাকে ছেলের সমপরিমাণ বেতনে প্রতিষ্ঠানের লজিস্টিকস বিভাগে চাকরী দিয়েছেন তিনি। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বসের এমন মানবিক ও নৈতিক সিদ্ধান্তের যেমন ব্যাপক প্রশংসা হচ্ছে, তেমনি ব্যক্তিগত কারণে চাকরিচ্যুতির বিষয়টি শ্রম আইনের পরিপন্থী কি না, তা নিয়ে কিছুটা বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছে।

[ধন্যবাদ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে। এটিই হ'ল ইসলামের বিধান। যেখানে মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত বলা হয়েছে (নাসাঈ হা/৩১০৪)। এই ঘটনার মধ্যে সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। (স.স.)]

মুসলিম জাহান

২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম এআই হাব হ'তে যাচ্ছে তুরস্ক

২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হাব হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ২০২৬-২০৩০ সাল মেয়াদী নতুন কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে তুরস্ক। প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জন ও উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান সম্প্রতি এই রূপরেখায় স্বাক্ষর করেছেন। পরিকল্পনার আওতায় আগামী দুই বছরে দেশের ৮১টি প্রদেশের ৫০ লাখ নাগরিককে এআই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি ১০ হাযার উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও ১ লাখ এআই পেশাজীবী তৈরী করা হবে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে ডেটা সেন্টারগুলোর সক্ষমতা ১ গিগাওয়াটে উন্নীত করা, বেসরকারী খাতে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের বাজেটের অন্তত ২ শতাংশ এআই প্রকল্পে ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য তুর্কী ভাষাগোষ্ঠীর দেশগুলোকে নিয়ে একটি অভিন্ন বৃহৎ ভাষা মডেল (LLM) এবং নিজস্ব রোবটিক প্রযুক্তি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তুরস্কের শিল্প ও প্রযুক্তিমন্ত্রীর মতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজস্ব মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানবজাতির কল্যাণে এআইয়ের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাতে চায় তুরস্ক।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চীনের রাস্তায় এবার এআই রোবট ট্রাফিক পুলিশ!

রোবট প্রযুক্তিতে চীনের অভাবনীয় অগ্রগতির এক নতুন নিদর্শন হিসাবে জেজিয়াং প্রদেশের হাংঝৌ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রথমবারের মতো ১৫টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক মানবসদৃশ রোবট ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। চাকাযুক্ত প্যাটফর্মের উপর দাঁড়ানো এবং উজ্জ্বল ইউনিফর্ম পরিহিত এই রোবটগুলো সত্যিকারের পুলিশের মতোই নিখুঁত অঙ্গভঙ্গিতে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এরা পর্যটকদের পথ দেখানো, নিয়ম ভঙ্গকারীদের সতর্ক করা এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করছে। সবচেয়ে নিবেদিত মানব ট্রাফিক পুলিশের পক্ষেও এসব কাজ টানা আট ঘণ্টা ধরে করে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। রোদ-বৃষ্টি বা দূষণের মাঝেও দীর্ঘক্ষণ ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতে পারা এই রোবটগুলোকে মানব পুলিশরাও আনন্দের সাথেই তাদের নতুন সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাসিক ইজতেমা

১৭ই জুলাই শুক্রবার রংপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মতীউর রহমান।

৩১শে জুলাই শুক্রবার সন্তোষপুর, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক সোহেল বিন আকবর।

১৪ই আগষ্ট শুক্রবার উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরীব যেলার শাহ মাখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া নতুন (তাহরীক চত্বর) আহলেহাদীছ মসজিদে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি ও আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক সোহেল বিন আকবর, রাজশাহী-সদর আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা প্রমুখ।

তা'লীমী বৈঠক

২৪শে জুলাই শুক্রবার শুকলপট্টি, নাটোর : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব হাফেয গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী।

৭ই আগস্ট শুক্রবার ভিটামাটি, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন ভিটামাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ

৮ই আগস্ট শনিবার জাতআমরুল, আত্রাই, নওগাঁ : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার আত্রাই উপযেলাধীন জাতআমরুল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলাউদ্দীন সিরাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ এহসান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম।

তাবলীগী সভা

লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর ২৪ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব লক্ষীপুর যেলা সদরের ২নং ওয়ার্ডে প্রতিষ্ঠিত আল-'মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মোস্তফা মাহতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মশিউর রহমান সাগর, 'আন্দোলন' ঢাকা যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার, বর্তমান সেশনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ অলী হাসান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লক্ষীপুর দারুল উলূম কামিল মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রিন্সিপাল কাজী ফারূকী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মাওলানা আলাউদ্দীন ওমর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' লকক্ষীপুর যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ তারেকুর রহমান।

দেবিদ্বার, কুমিল্লা ৭ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার দেবিদ্বার থানা সদরের গোমতী আবাসিক এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বাইতুল আক্বছা সালাফিইয়া জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলী হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আতীকুর রহমান, অত্র মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, যেলা 'যুবসংঘ-এর সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আল-আমীন। অনুষ্ঠানে যেলা ও উপযেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ গত ৩-৯ই আগস্ট রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার তানোর থানাধীন কৃষ্ণপুর, কচুয়া, জিতপুর, কুন্দাই, দেবীপুর, সেলামপুর, লালপুর, বিলশহর, বানিয়াল, চাঁদপুর, নারায়ণপুর, গোকুল, চাপড়া, ধানতৈড়, কুঠিপাড়া, গুবিরপাড়া ও তানোর বাজার এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

‘তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা’ শীর্ষক সেমিনার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২১শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টা থেকে ৬-টা পর্যন্ত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ গ্যালারী-১-এ ‘তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘ’ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ও বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মুদ্দাছির ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সেমিনার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিভাগ-এর চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দীক। সেমিনারে গবেষণাপত্র পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

সেমিনারে আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার সাবেক কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ হেদায়েত উল্লাহ, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ওছমান মেহেদী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক যাকারিয়া খান, ‘আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুন নূর, ইসলামী দাঈ ও উদ্যোক্তা আহমাদ আরেফীন, এক্সিস গ্রুপের সিইও ইঞ্জিনিয়ার হাফীযুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সম্পাদক যহূরুল ইসলাম।

আলোচকগণ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মের আত্মবিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকা নিয়ে গভীর ও তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ অধিবেশনে প্যানেল আলোচনা ও উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন এবং আলোচকবৃন্দ সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

‘উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আক্বীদা ও মানহাজ প্রসারে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর অবদান’ শীর্ষক সেমিনার

২৯শে জুলাই বুধবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে অদ্য বিকাল ৫-টায় ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে ‘উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আক্বীদা ও মানহাজ প্রসারে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর অবদান’ শীর্ষক মাসিক গবেষণা সেমিনার-২ অনুষ্ঠিত হয়। ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং হাফাবা গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন গবেষণা বিভাগের সিনিয়র গবেষণা সহকারী ও মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এবং ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং মারকাযের প্রিন্সিপাল হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর জুনিয়র গবেষণা সহকারী এবং কো-অর্ডিনেটর মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষা ২০২৬-এর ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী :

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী গৌরবোজ্জ্বল ফলাফল অর্জন করেছে। এবছর সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৫০জন ছাত্র ও ৪৪জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ৯৪জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

তন্মধ্যে ৪১জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ১২জন গোল্ডেন (A+), ৪৪জন A ও ৯জন A-গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মোট ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ১৮জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ৩জন গোল্ডেন (A+)), ২৪জন A গ্রেড ও ৮জন A-গ্রেড পেয়েছে। মোট ৪৪জন ছাত্রীর মধ্যে ২৩জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ৯জন গোল্ডেন (A+), ২০জন A গ্রেড ও ১জন A-গ্রেড পেয়েছে। বি. দ্র. সারাদেশে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির গড়ে দেশের সেরা ৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মারকাযের অবস্থান ২য়। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : ২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯জন শিক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১জন জিপিএ ৫.০০ (A+), ৬জন (A), ৩জন A-, ৫জন (B) ও ৩জন (C) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ পাবনা যেলার অর্থ সম্পাদক ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী (বিনা)-তে কর্মরত মুহাম্মাদ আকরাম হোসাইন (৫৯) গত ৯ই আগস্ট রোজ রবিবার বিকাল ৪-টায় তীব্র বুকের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘ঊন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। ঐদিন রাত সাড়ে ৯-টায় ঈশ্বরদী উপযেলাধীন অরণকোলা হাট জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী শাহান মাস্টার। জানাযা শেষে তাকে ঈশ্বরদী কেন্দ্রীয় গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, মুহাম্মাদ সোহরাব আলী, বর্তমান সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক এস. এম তারিক হাসান, ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি হাফেয শরীফুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি হাসান আলীসহ যেলা ‘আন্দোলন’, ‘যুবসংঘ’, ‘সোনামণি’র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর?

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)
লিখিত প্রশ্ন করুন - www.at-tahreek.com/qa

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : একটি হাদীছে নারীদের দ্বীনের কমতি হায়েযের কারণে বলা হয়েছে। অথচ হায়েয তো নারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। বরং সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তাহ'লে এটিকে কিভাবে দ্বীনের কমতি বলা হয়? অন্য হাদীছে ছালাতে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে গাধা ও কালো কুকুরের সঙ্গে নারীদের কথা এসেছে। এ ধরনের হাদীছ পড়ে আমার মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, ইসলামে নারীর মূল্য কি সত্যিই কম? নাকি এসব হাদীছের অন্য কোন ব্যাখ্যা রয়েছে?

-আরিফ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : হায়েযের কারণে দ্বীনের কমতি বলতে নারীর ঈমান, মর্যাদা বা আল্লাহ্র কাছে মূল্য কম বুঝানো হয়নি; বরং শারঈ বিধানের কারণে কিছু ইবাদত সাময়িকভাবে মওকূফ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'নারীর আকল বা মেধার এই ঘাটতিটি মূলত তার স্মরণশক্তি বা মুখস্থ রাখার দুর্বলতার দিক থেকে বিবেচিত। আর এই কারণেই (আদালতে) তার সাক্ষ্যকে অপর একজন নারীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে সুদৃঢ় বা পরিপূরক করা হয়। আর এটি করা হয়েছে সাক্ষ্যের বিষয়টিকে নিখুঁত ও সংরক্ষিত রাখার স্বার্থে। যেমনটি মহান আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ করেছেন... *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।

আর নারীর দ্বীনের ঘাটতির বিষয়টি হ'ল সে যখন হায়েয অবস্থায় থাকে, তখন সে ছালাত ত্যাগ করে এবং পরবর্তীতে তাকে এই ছালাতগুলোর ক্বাযা আদায় করতে হয় না। মূলত এটিই হ'ল দ্বীনের ঘাটতি। তবে এই ঘাটতির কারণে সে কোনভাবেই অপরাধী বা গুনাহ্গার হবে না। বরং এই ঘাটতিটি স্বয়ং মহান আল্লাহ্র বিধানের আলোকেই সাধিত হয়েছে, যা তিনি কেবল নারীর প্রতি দয়া ও তার কষ্ট লাঘব করার জন্যই করেছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৯২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/২৫০)*।

একইভাবে নারী, গাধা ও কালো কুকুর মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমের হাদীছও নারীর অবমূল্যায়নের জন্য নয়; বরং ছালাতের একটি নির্দিষ্ট ফিক্বহী বিধান বর্ণনার জন্য। এখানে পরনারী থেকে পর্দার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সুৎরার বাইরের অংশ দিয়ে অতিক্রম করলে ছালাত নষ্ট হবে না। এজন্য দেখা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন আর আয়েশা (রাঃ) পা মেলে শুয়ে থাকতেন। রাসূল (ছাঃ) যখন সিজদা দিতেন তিনি পা সরিয়ে নিতেন। আবার দাঁড়িয়ে গেলে পা মেলে দিতেন *(বুখারী হা/৩৮২; মিশকাত হা/৭৮৬)*। তাই এসব হাদীছকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়; বরং সামগ্রিক শারঈ প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে। ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ বলেন, 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : ছিফফীনের যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছেন তাদেরকে শহীদ বলা যাবে কি?

-শোয়াইব মুনীরী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উভয় পক্ষের নিহত ছাহাবীদের ব্যাপারে শাহাদাতের আশা করা যায়। তবে ষড়যন্ত্রকারী খারেজীদের ব্যাপারে নয়। কারণ ছাহাবীরা উভয় পক্ষই নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে সঠিক মনে করেছিলেন। সেজন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর ছাহাবীদের মধ্যে যেসমস্ত ফিৎনা ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। উভয় পক্ষের নিহতদের জন্য মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁদের সবার প্রতি আল্লাহ্র রহমত কামনা করা আবশ্যক। সেই সাথে ছাহাবীগণের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগামী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা এবং তাঁদের গুণাবলী ও প্রশংসা উম্মতের মাঝে প্রচার করা কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না *(হাশর ১০)*।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, উষ্ট্র ও ছিফফীনের যুদ্ধের দিন যা ঘটেছিল, তার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কারণ আলী (রাঃ) এই যুদ্ধগুলোর ফলাফল বা রক্তপাতে বিন্দুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করেননি; বরং তাঁর থেকে গভীর দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের আলোকেই এই যুদ্ধ করেছিলেন *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/৩৯৫)*। তিনি আরো বলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন এই সমস্ত ছাহাবীগণের কারোরই যুদ্ধ করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এই যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত তাঁদের নিজেদের ইচ্ছা বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তৃতীয় পক্ষ ঘাতকদের গোপন হামলার কারণে ঘটে গিয়েছিল *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৩১৬)*। ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, 'আর উষ্ট্রের যুদ্ধে ছাহাবীগণের শরীক হওয়ার ব্যাপারটি হ'ল তাঁরা কখনোই আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা বা সংকল্প করেননি এবং আলী (রাঃ)ও তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিয়ত করেননি। তাঁরা মূলত মদীনা থেকে বছরায় সমবেত হয়েছিলেন ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিষয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এবং তাদের ওপর আল্লাহ্র হদ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ওছমান হত্যাকারীরা নিজেদের ওপর আল্লাহ্র হদ কার্যকর হওয়ার ভয়ে ভীত ছিল আর তাদের সংখ্যাও ছিল বিশাল। তারা গোপনে অতর্কিত হামলা চালায়। ফলে উভয় পক্ষই যখন দেখল যে তলোয়ার তাদের ওপর আঘাত হানতে শুরু করেছে, তখন তারা প্রত্যেকেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে স্রেফ নিজেদের জীবন রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে বাধ্য হন *(আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ২/৮৫)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াতে উল্লেখ আছে ধর্মের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। তাহ'লে ইসলামী আইনে ধর্মত্যাগীদের যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, সেটা উক্ত আয়াতের সাথে কিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে?

-ইব্রাহীম, ফার্মগেট, ঢাকা।

উত্তর : এ দু'টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ 'দ্বীনের ব্যাপারে যবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)* আয়াতটি কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করার নীতি বর্ণনা করে। আর মুরতাদের শাস্তি হ'ল এমন ব্যক্তির ব্যাপারে, যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম ত্যাগ করেছে। তাই বিষয় দু'টি ভিন্ন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/২৩১-২৩৪)*। বিষয় দু'টি হ'ল : (১) ইসলামে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন অমুসলিমকে বাধ্য করা যাবে না। (২) ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেলে একজন মুসলিম যেমন একদিকে আল্লাহদ্রোহী হয়, অপরদিকে সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক চুক্তি লঙ্ঘন করে। যা ধর্মদ্রোহ এবং দেশদ্রোহিতার শামিল, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তোমরা তাকে হত্যা করো' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫৩৩)*।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, দ্বীনে প্রবেশ করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না। কারণ এই দ্বীন অত্যন্ত স্পষ্ট। এর প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ অতিশয় প্রকট। সুতরাং এতে প্রবেশের জন্য কাউকে বাধ্য করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইসলামের দিকে হেদায়াত দান করেন, যার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন এবং যার অন্তর্দৃষ্টিকে আলোকিত করেন, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এতে প্রবেশ করে। আর আল্লাহ যার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তার কান ও চোখের উপর আবরণ টেনে দিয়েছেন, তাকে বাধ্য বা যবরদস্তি করে দ্বীনে প্রবেশ করালে সে অন্তরে মুনাফিকই থেকে যাবে, যা কোন উপকারে আসে না *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

আর মুরতাদের শাস্তির পেছনে মূল হিকমত হ'ল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা। যদি ধর্মত্যাগের কোন শাস্তি না থাকত, তবে লোকেরা সহজে ইসলামে প্রবেশ করত এবং পরক্ষণেই বের হয়ে যেত। এতে দ্বীনের ভাবমূর্তি নষ্ট হ'ত এবং মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন তৈরী হ'ত। সুতরাং এই আইনটি মূলত একটি 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা', যা মানুষকে দ্বীন নিয়ে খামখেয়ালী কর্ম করতে বাধা দেয় এবং মুসলিম সমাজের সংহতি রক্ষা করে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ বিষয়ে বলেন, মুরতাদ ব্যক্তিকে যদি হত্যা করা না হ'ত, তবে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে আবার তা থেকে ইচ্ছামত বের হয়ে যেত। সুতরাং তাকে হত্যা করার বিধান মূলত দ্বীন এবং দ্বীনদারদের হেফাযত করার মাধ্যম। কারণ এই বিধান দ্বীনের মধ্যে কোন ঘাটতি বা ভাঙন তৈরী হওয়া রোধ করে এবং মানুষকে দ্বীন থেকে বের হয়ে যেতে বাধা দেয়। তবে যে ব্যক্তি আদৌ দ্বীনে প্রবেশই করেনি, তার বিষয়টি এর বিপরীত অর্থাৎ তাকে বাধ্য করা হয় না' *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/১০২)*। মোটকথা ইসলামী শরী'আতে কাউকে মুসলিম হ'তে বাধ্য করার বিধান যেমন নেই, তেমনি মুসলিম হওয়ার পর কাউকে ইসলামের ভিত্তি ও সমাজ কাঠামোকে ভেঙে ফেলার কোন অধিকারও দেওয়া হয় না।

উল্লেখ্য যে, 'দ্বীনের ব্যাপারে যবরদস্তি নেই'-এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা দ্বীন প্রচারে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হ'ল দ্বীন গ্রহণে কাউকে জোর করা যাবে না; তবে যুক্তি, সুন্দর আচরণ ও ভালোবাসার মাধ্যমে অমুসলিমদের কাছে ইসলামী সত্যতার দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ সবসময় জারী রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : কবর খননের সময় প্রথম কোদালের মাটি মৃত ব্যক্তির ডান বা বাম পাশে রাখার কোন শারঈ বিধান আছে কি? কবর খননের সময় যদি পূর্বের কোন কবরের হাড় পাওয়া যায়, তাহ'লে সেগুলো কি করতে হবে?

-বেলায়েত, কাপাসিয়া, গাযীপুর।

উত্তর : প্রথমত কবর খননের সময় প্রথম কোদালের মাটি মৃত ব্যক্তির ডান বা বাম পাশে রাখার বিশেষ কোন বিধান শরী'আতে নেই। তাই এটিকে সুন্নাত বা বিশেষ নিয়ম মনে করা বিদ'আত হবে। **দ্বিতীয়ত** কবর খননের সময় যদি পূর্ববর্তী কোন মৃত ব্যক্তির হাড় বা দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তাহ'লে তা যথাসম্ভব সম্মানের সঙ্গে এক পাশে রেখে একই কবরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একটি জানাযার ছালাতে শরীক হ'তে বের হ'লাম। আমরা যখন কবরের কাছে পৌঁছালাম, তখন দেখা গেল কবরটি খনন করার কাজ তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। তাই নবী (ছাঃ) কবরের এক পাশে বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসলাম। এমন সময় কবর খননকারী ব্যক্তি কবরের ভেতর থেকে একটি মানুষের হাড়, পায়ের নলা অথবা হাতের বাহুর হাড় বের করল এবং সে সেটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিল। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, 'এটি ভেঙো না! কারণ মৃত মানুষের হাড় ভেঙে ফেলা, জীবিত মানুষের হাড় ভেঙে ফেলার মতোই। বরং সেটিকে কবরের এক পাশে যত্নসহকারে দাফন করে দাও' *(আবুদাউদ হা/৩২০৭; আওনুল মা'বূদ ৯/১৮; মির'আত ৫/৪৪৯;)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : তিন তালাকের পর আগের স্বামীর কাছে ফিরে আসার জন্য নারীকে অন্য পুরুষকে বিবাহ করা এবং স্বাভাবিক সংসার হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে শরী'আতে এরূপ শর্তারোপের তাৎপর্য কি?

**-শফীউল্লাহ, নাটোর।*

**[ছফিউল্লাহ নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) শরী'আতের বিধান বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতঃপর কোনটির হিকমত বর্ণনা করেছেন, আবার কোনটির হিকমত বর্ণনা করেননি। মুমিনের কাজ হচ্ছে দ্বিধাহীন চিত্তে শরী'আতের বিধান মেনে চলা। তবে বিদ্বানগণ তালাককে তিন সংখ্যায় সীমিত করার কিছু হিকমত বর্ণনা করেছেন। তালাককে কঠিনভাবে নিরুৎসাহিত করাই মূল উদ্দেশ্য হলেও আরো কিছু হিকমত রয়েছে। যেমন-

১. শরী'আত তিন তোহরে তিন তালাক প্রদানকে বিধিবদ্ধ

করেছে। এক তালাক দেওয়ার পর যাতে নিজের ভুল সংশোধন করতে পারে সেজন্য রাজা'আতের সুযোগ রাখা হয়েছে। এরপরেও যদি সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হয় তাহলে আরেক তালাক দিয়ে চিন্তা ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এরপরেও যদি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে না পারে তাহ'লে জানতে হবে যে, কোনভাবেই উক্ত মেয়ের সাথে সংসার করা সম্ভব নয়। এক্ষণে যে মেয়ের সাথে সংসার করা সম্ভব নয় বলে তৃতীয় তালাক দেওয়া হ'লে তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। বরং অন্যত্র বিবাহ হলে এবং স্বাভাবিকভাবে তালাক তালাকপ্রাপ্তা হলে অতঃপর উভয়ের বিবাহ হ'লে দু'জন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে সংসার করবে বলে আশা করা যায়।

২. তিন তালাকের পরেও রাজা'আতের সুযোগ থাকলে লোকেরা তালাকের বিধানকে অনেক হালকা মনে করত এবং স্ত্রীকে অসংখ্যবার তালাক দিত এবং ফিরিয়ে নিত।

৩. তালাক বিষয়টি স্ত্রীর জন্য অনেক কষ্টদায়ক। সেজন্য তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনের অধিক তালাক দিয়ে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৪. নারীর অন্যত্র বিবাহের সুযোগ রাখা। কোন পুরুষ যাতে স্ত্রীর সাথে বছরের পর বছর ছলনা করতে না পারে সেজন্য এই সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৫. এছাড়া স্বামীর আত্মসম্মানবোধ পরীক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। স্বামী যাতে তিন তালাক দেওয়ার পূর্বে ভালোভাবে চিন্তা করে যে, স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও অন্যের শয্যাগ্রহণকারীকে পুনরায় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে *(তাফসীরে সা'দী; তাফসীরে রাযী, ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/২১৫; ইবনু 'আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত-তানভীর ২/৪১৫)*। দ্র. বড় কথা হ'ল ভুক্তভোগী নারী-পুরুষ এর যথার্থ ব্যাখ্যা বুঝতে পারেন।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : চার বছর অবৈধ সম্পর্কের পর হারাম বুঝতে পেরে মায়ের অমতে বিবাহ করি। মা আমাকে বদ দো'আ দেন। বিবাহের ১৮ দিন পর দুর্ঘটনায় আমার হাঁটু, পা, কোমর ভেঙ্গে যায়। ১ বছর যাবৎ আমি হাঁটতে পারি না। মায়ের কারণে স্ত্রীকে পিতার বাসায় থাকতে হয়। মা আমাকে তালাক দিতে বাধ্য করতে চাইছেন। স্ত্রী আমার সাথে থাকতে চায়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আহমাদ শরীফ, রাজশাহী।

উত্তর : পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে বিবাহ করা উচিৎ। তবে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে নিজেই নিজের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী। সেজন্য কোন ছেলে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে তা শরী'আত বিরোধী নয়। সুতরাং মায়ের উচিৎ হবে না ছেলের সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়ানো। আর ছেলের উচিৎ হবে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। ইবনু আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলেন, 'আমি তোমাকে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারছি না আবার পিতা-মাতার অবাধ্যতা করারও আদেশ করছি না। প্রশ্নকারী বললেন, তাহ'লে আমি এই নারীর ব্যাপারে কি করব? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (স্ত্রীকে রেখেই) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯০৫৯, ১৯০৬০; হাকেম হা/২৭৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৮৬, ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও আবুদ্দারদা বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ)*। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিচ্ছেন। (আমি কি করব?) তিনি বললেন, তুমি তালাক দিয়ো না। বর্ণনাকারী বলল, ওমর (রাঃ) কি তার ছেলে আব্দুল্লাহকে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেননি। তিনি বললেন, তোমার বাবা কি ওমরের মত হয়েছেন'? *(মুহাম্মাদ ইবনু মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারঈয়া ১/৪৪৭)*।

অর্থাৎ সব পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না। একদিন প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা (রহঃ)-কে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যার স্ত্রী ও মা রয়েছেন। আর তার মা তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি বললেন, 'সে যেন তার মায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে'। তাকে বলা হ'ল, সে কি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে? তিনি বললেন, না। তাকে বলা হ'ল, মা যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ব্যতীত খুশি নন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট না করুন। স্ত্রী তার হাতে রয়েছে, সে যদি তালাক দেয় তাতেও কোন দোষ নেই। আবার না দিলেও কোন দোষ নেই' *(মারওয়াযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৫৮, সনদ হাসান)*।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে মায়ের কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'তার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হালাল হবে না। বরং তার জন্য আবশ্যক হ'ল মায়ের সাথে সদাচরণ করা। আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১১২)*। অতএব স্পষ্ট শারঈ কারণ ছাড়া পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : হজ্জব্রত পালনের আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ এ কথা বলে যে, হজ্জ তো পরে করলেও হবে। এই ধারণায় হজ্জ আদায় না করে শুধু ওমরাহ পালন করলে সে গোনাহগার হবে কি?

-মামূনুর রশীদ, মিরপুর-১২, ঢাকা।

উত্তর : কেবল ওমরা পালন করে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না। সুতরাং সামর্থ্য হওয়ার পর হজ্জ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করলে গোনাহগার হ'তে হবে' *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৩৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা হজ্জ আদায়ে তাড়াতাড়ি কর; কেননা তোমাদের কেউ জানে না, পরে তার কি প্রতিবন্ধকতা এসে পড়বে *(আহমাদ হা/২৮৬৯; ছহীহুল জামে' হা/২৯৫৭)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি বিভিন্ন শহরে লোক পাঠাই। তারা দেখবে, যাদের হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করেনি, তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করবে। কারণ তারা প্রকৃত মুসলিম নয়, তারা প্রকৃত মুসলিম নয় *(আবুবকর খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ১৫৭১)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : এক ব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ছেলেরা জুম'আর দিন মসজিদে বিরিয়ানীর আয়োজন করে। এ বিষয়ে ইমাম ছাহেব বলেন, এটি জায়েয নয়; বরং বিদ'আত। এটা সঠিক কি? তবে খাবার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তিনি নিয়ত পরিবর্তন করে সাধারণ খাবার হিসাবে তা বিতরণ করার পরামর্শ দেন। এভাবে বিতরণকৃত খাবার খাওয়া কি জায়েয হবে?

-ইমরান ঈমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ইমাম ছাহেবের বক্তব্য সঠিক। যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে জুম'আর দিন মসজিদে বিরিয়ানী বা অন্য কোন খাবারের আয়োজন করা হয় তাহ'লে এটি বিদ'আত, যা বর্জন করা আবশ্যক। কারণ কুরআন-সুন্নাহ বা ছাহাবায়ে কেরামের আমলে মৃত্যুবার্ষিকী পালন কিংবা এ উপলক্ষে বিশেষ খাবারের আয়োজনের কোন প্রমাণ নেই। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন চালু করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪০)*। এক্ষণে রান্নাকৃত খাবার অপচয় রোধে সত্যিকার অর্থে নিয়ত পরিবর্তন করে সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে বিতরণ করা ও তা গ্রহণ করা যাবে। তবে এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : কোন বৈঠক বা সম্মেলনের শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : কোন অনুষ্ঠান বা সম্মেলন শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এভাবে দো'আ করা বিদ'আত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩২-৩৩ পৃঃ)*। বরং এসময় মজলিস ভঙ্গের শরী'আত নির্দেশিত দো'আটি পাঠ করবে *(তিরমিযী হা/৩৪৩৩)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : বিবাহের সময় কনে মেকআপ নষ্ট হওয়ার ভয়ে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ছালাত শুদ্ধ হবে না। কারণ পানি মওজূদ থাকতে এবং তা ব্যবহারে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেবল প্রসাধনী নষ্ট হওয়ার ভয়ে শরী'আতে তায়াম্মুম বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা কেবল পানি না পাওয়ার শর্তে বা অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করার অনুমতি দিয়েছেন *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : নবী করীম (ছাঃ) আছর ও ফজর ছালাত ব্যতীত অন্যান্য ছালাতে মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসতেন না। এরকম কোন হাদীছ আছে কি?

-ফযলুর রহমান, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : এরূপ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং রাসূল (ছাঃ) ফজর ও আছর ছালাতসহ প্রত্যেক ছালাতে মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসতেন *(বুখারী হা/১৩৮৬; মুসলিম হা/২২৭৫; মিশকাত হা/৪৬২১)*। সামুরাহ (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি ছালাত শেষ করতেন, তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন' *(বুখারী হা/৮৪৫)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, আর এই হাদীছগুলোর মধ্যে ছালাত সমাপ্ত করার পর মুক্তাদীদের মুখোমুখি হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর তা নিয়মিত ও ধারাবাহিক বজায় রাখারও প্রমাণ পাওয়া যায়; কারণ 'কানা' (كَانَ) শব্দটি সাধারণত ধারাবাহিকতা ও নিয়মিত অভ্যাসের অর্থ প্রকাশ করে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৩০০)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) সকল ছালাতের সালামান্তে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন বলে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মুসলিম হা/৪২৪; মিশকাত হা/৯৪৪)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : পারিবারিকভাবে বিয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর আক্বদ সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বৈধ কি? বাস্তবে এ ধরনের যোগাযোগ অনেক সময় হালালের মোড়কে হারাম সম্পর্কের রূপ ধারণ করে। এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি?

-মেহেদী হাসান, চর বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রী পরস্পরের জন্য গায়ের মাহরাম। সুতরাং তাদের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ, একান্তে কথা বলা, প্রেমালাপ, বারবার ফোনে বা মেসেজে আলাপ, ভিডিও কল, সাক্ষাৎ বা ঘোরাঘুরি করা কোনটাই বৈধ নয়। কারণ কেবল বিয়ের প্রতিশ্রুতি বা বাগদান কোন নারীকে পুরুষের জন্য হালাল করে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন পুরুষ কোন পরনারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করবে না। কেননা তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান *(তিরমিযী হা/১১৭১; ছহীহুত তারগীব হা/১৯০৮)*। তবে যদি তা বিবাহ সংক্রান্ত কল্যাণে হয় এবং তার পিতা-মাতা ভাই অথবা অন্য কোন মাহরামের উপস্থিতিতে হয়। তবে এতে কোন বাধা বা গোনাহ নেই *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/১০৮)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : হানাফী মাযহাবের অনুসারী এক ব্যক্তি রাগের মাথায় প্রথমে এক তালাক দেন। অতঃপর তিনদিন পর আবার তালাক দেন। কয়েকমাস পর স্ত্রীর এক অপরাধের কারণে তিনি পুনরায় এক তালাক দেন। প্রতিবারই তিনি রুজূ' করেন এই ধারণায় যে, রুজূ' করলে পূর্বের তালাকের গণনা আর বহাল থাকে না। পরে জানতে পারেন, তিন তালাক সম্পন্ন হয়ে গেছে। এরপর উভয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদ করেন। বর্তমানে তাদের সন্তানদের কথা বিবেচনা করে তিনি প্রথম স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চান। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন এবং সেই সংসারেও সন্তান রয়েছে। এ অবস্থায় শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রথম স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার কোন সুযোগ আছে কি?

-আব্দুল আলীম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : প্রত্যেক তালাকের পর রুজূ করলেও পূর্বে সংঘটিত তালাকের সংখ্যা বাতিল হয়নি। ফলে তিনবার পৃথক তালাক সংঘটিত হওয়ায় তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সেকারণে উক্ত স্ত্রীকে এ অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। তবে উক্ত স্ত্রীর যদি অন্যত্র বিবাহ হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হয় বা বিধবা হয় তাহ'লে

ইদ্দত পালন শেষে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২৩০; বিস্তারিত দ্র. 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : জিন-শয়তানদের সংখ্যা কত? তাদেরও কি বংশবৃদ্ধি হয়? যদি হয়ে থাকে, তাহ'লে তাদের সন্তানরা কি জন্মগতভাবেই শয়তান হয়, নাকি তাদের মধ্যেও ঈমান ও সৎপথ গ্রহণের সুযোগ থাকে?

-আফরোজা, ঢাকা।

উত্তর : জিন-শয়তানের সংখ্যা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাদেরও বংশ বৃদ্ধি হয় এবং তাদের সন্তানেরাও ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন, আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। জিনদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'আর (কুরআন শোনার পরেও) আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছি মুসলিম ও কিছু রয়েছি কাফের' *(জিন ৭২/১৪)*। তিনি আরো বলেন, জিনেরা বলল, আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মশীল। আর কতক রয়েছে এর বিপরীত। আমরা তো বিভিন্ন তরীকায় বিভক্ত' *(জিন ৭২/১১)*।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : এক ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহের পর দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করেননি। পরে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেলে তিনি প্রথম স্ত্রীকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে নিতে চান। কিন্তু প্রথম স্ত্রী ফিরে যেতে রাযী নন। উল্লেখ্য, তাঁদের মধ্যে কখনো তালাক হয়নি। এমতাবস্থায় প্রথম স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি গোনাহগার হবেন কি? উভয়ের করণীয় কি?

-আব্দুল করীম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : শারঈ দৃষ্টিতে যেহেতু এখনো তালাক হয়নি, তাই প্রথম স্ত্রী তাঁর বৈধ স্ত্রী। স্বামীর উপর তাঁর স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ, বাসস্থান ও অন্যান্য দাম্পত্য অধিকার প্রদান করা ফরয ছিল। ২৫ বছর স্ত্রীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা অন্যায় ও গুনাহের কাজ হয়েছে, যদি এর পিছনে শারঈ কোন ওযর না থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর' *(নিসা ৪/১৯)*। এক্ষণে স্ত্রীর করণীয় হচ্ছে স্বামীর ডাকে সাড়া দিয়ে সংসার করা। স্ত্রী সংসার করতে না চাইলে সে খোলা' তালাক নেওয়ার মাধ্যমে নিজেকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে। আর স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে- স্ত্রী সংসার করতে না চাইলে সুন্দরভাবে বিদায় করে দিবে। আল্লাহ বলেন, 'সদ্ভাবে স্ত্রীকে রেখে দাও, নতুবা সুন্দরভাবে বিদায় দাও' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : এক ব্যক্তি পূর্বে আন্তর্জাতিক খেলাধুলা নিয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন। বর্তমানে দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে তিনি সে ধ্যান-ধারণা থেকে অনেকটাই ফিরে এসেছেন। তবে জীবিকার প্রয়োজনে তিনি একটি ক্রীড়া নিউজ পোর্টালে রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেন এবং নিজ কণ্ঠে খেলাধুলার সংবাদ উপস্থাপন করেন। তার এ কাজের জন্য প্রাপ্ত পারিশ্রমিক কি হালাল হবে?

-শরীফুল আলম, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিকতা যদি হারাম বিষয়ের প্রচার, প্রসার বা সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম হয়ে থাকে, তাহ'লে সে কাজে যুক্ত হওয়া এবং তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে যদি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজটি এসব হারাম উপাদান থেকে মুক্ত থাকে, তাহ'লে তার হুকুমও সেই বাস্তবতার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্র আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। আর যারা তা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের সব ধরনের খেল-তামাশা অনর্থক; তবে তিনটি বিষয় ব্যতীত: তীরন্দাজির অনুশীলন করা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ করা, এসব বৈধ' *(আহমাদ হা/১৭৩৩৮ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৩৮৭২)*।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : মিসওয়াকে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে হাদীছটি কি ছহীহ?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এটি কালোজিরার ফযীলতে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫৬৮৮; আহমাদ হা/২৫১৭৬)*। আর মিসওয়াকের ফযীলতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা সাধনকারী এবং রবের সন্তুষ্টির কারণ' *(নাসাঈ হা/৫; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯)*। তিনি আরো বলেন, 'বান্দা যখন মিসওয়াক করে ছালাতে দাঁড়ায়, তখন একজন ফেরেশতা এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তার তিলাওয়াত শোনেন। তিনি বান্দার এতই নিকটে আসেন যে তাঁর মুখমণ্ডল বান্দার মুখের ওপর স্থাপন করেন। এর ফলে বান্দার মুখ থেকে কুরআনের যে অংশই বের হয়, তা সরাসরি সেই ফেরেশতার পেটে প্রবেশ করে। সুতরাং তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নিজেদের মুখমণ্ডলকে পবিত্র রাখো' *(ছহীহাহ হা/১২১৩; ছহীহুল জামে' হা/৭২৩)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : সূরা কাহফের ৪৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত আল-বাক্বিয়াতুছ ছালিহাতু (الباقيات الصالحات) বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

-শহীদুল ইসলাম, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। অথচ চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর নিকটে প্রতিদান হিসাবে উত্তম এবং কাংখিত হিসাবেও উত্তম' *(কাহফ ১৮/৪৬)*। এর ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের ঢাল (আত্মরক্ষার হাতিয়ার) গ্রহণ কর। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শত্রু কি আক্রমণ করেছে? তিনি বললেন, না। বরং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল গ্রহণ করো। তোমরা বল, 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার'। কারণ এই যিকিরগুলো ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী, অগ্রগামী, পশ্চাদ্গামী ও রক্ষক হিসাবে উপস্থিত হবে। আর এগুলোই হ'ল স্থায়ী সৎকর্ম বা আল-বাক্বিয়াতুছ ছালিহাত *(ছহীহুত তারগীব হা/১৫৬৭; ছহীহাহ হা/৩২৬৪)*। এ ব্যাপারে একাধিক ছাহাবী থেকে ছহীহ সনদে একাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর দ্বারা কেবল এই

চারটি যিকিরই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল নেক আমল বুঝায়, যা আখেরাতে মানুষের জন্য স্থায়ী ছওয়াব হিসাবে থেকে যায়। যেমন, ছালাত, ছিয়াম, যিকর, ছাদাক্বা, কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য সৎকর্ম সমূহ। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, প্রকাশ্য ও অগ্রাধিকারযোগ্য মত হ'ল, *আল-বাক্বিয়াতুছ ছালিহাত* বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এটিকে কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যৌক্তিকতা নেই *(ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : বর্তমানে কিছু জেনারেল শিক্ষিত ভাই অল্প দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করেই দাওয়াতী কাজ শুরু করেন এবং মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। পর্যাপ্ত ইলম অর্জনের আগে এভাবে দাওয়াত ও খুৎবা দেওয়া কতটুকু শরী'আতসম্মত? একজন ব্যক্তির দাওয়াতী কাজ ও খুৎবা প্রদানের জন্য ন্যূনতম কি পরিমাণ দ্বীনী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?

*-*অনিক, হারাগাছ, রংপুর।*
[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : জুম'আর খুৎবা প্রদান এবং মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সার্টিফিকেটধারী আলিম হওয়া শর্ত নয়। তবে যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেওয়া হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই একজন সাধারণ মুসলিম তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ছালাত, নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানে, তা প্রচার করতে পারে; কিন্তু মতভেদপূর্ণ বা জটিল ফিক্বহী মাসআলা, আক্বীদার সূক্ষ্ম বিষয় বা ফৎওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। তিনি বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না' *(ইসরা ১৭/৩৬)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো না, যে বিষয়ে তোমরা কিছু জানো না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অতঃপর যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা বানাবে। তাদের কাছে প্রশ্ন করা হবে, তারা জ্ঞান ছাড়াই ফৎওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে' *(বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩)*। অতএব, অল্প দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করেই নিয়মিত জুম'আর খুৎবা দেওয়া বা জটিল মাসআলায় বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়। তবে যে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা আছে, তা মানুষকে পৌঁছে দেওয়া সুন্নাত। আর খুৎবা ও দাওয়াতের প্রকৃত ভিত্তি হ'ল বিশুদ্ধ ইলম, প্রজ্ঞা ও জাগ্রত জ্ঞান।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত আদায়ের বিষয়ে ফক্বীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, জামা'আতে এক রাক'আত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আগে সুন্নাত আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

-রাশেদুল ইসলাম, নরসিংদী।

উত্তর : ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেলে প্রথমে জামা'আতে শরীক হওয়াই কর্তব্য। জামা'আত ছেড়ে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করা উচিত নয়, বিশেষত যদি এতে তাকবীরে তাহরীমা বা জামা'আতের অংশ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ছাড়া আর কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮)*। একদা ফজরের ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, মুওয়াযি্যন যখন ইক্বামত দিচ্ছে, তখন সে সুন্নাত ছালাত আদায় করছে। ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি ফজরের ছালাত চার রাক'আত আদায় করেছ? *(মুসলিম হা/৭১১)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে যখন ইমাম ফজরের ফরয ছালাত শুরু করে দিয়েছেন, তার জন্য ওয়াজিব হ'ল সে ইমামের সাথে ছালাতে শরীক হয়ে যাবে। ছুটে যাওয়া সুন্নাতকে ফরয ছালাতের পর অথবা সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩৭১)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আর ছালাতের ইক্বামত হয়ে যাওয়ার পর কারো জন্যই নতুন করে কোন সুন্নাত ছালাত শুরু করা হালাল নয়। সুতরাং কেউ যদি তা করে, তবে সে রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল। কোন মুছল্লী যদি তা করেই ফেলে, তবে ঐ ছালাত বাতিল বা অকার্যকর বলে গণ্য হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১০১)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : আমি একটি মাদ্রাসায় শরহে বেকায়া জামা'আতে পড়ি। আসন সংকটের কারণে এক সহপাঠীর সঙ্গে একই খাটে থাকতে হয়। তবে আমাদের শরীর একে অপরের সঙ্গে স্পর্শ করে না এবং প্রত্যেকে পৃথক কম্বল ব্যবহার করি। এভাবে একই খাটে থাকতে পারবো কি?

-হাসান আলী, শেরপুর।

উত্তর : মধ্যে আড়াল রেখে একই বিছানায় দু'জন থাকা যাবে। কারণ কম্বল আলাদা ব্যবহার করায় পরস্পরের শরীরে স্পর্শ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে এক কাপড়ের নীচে থাকবে না এবং কোন নারী অন্য নারীর সঙ্গে এক কাপড়ের নীচে থাকবে না *(মুসলিম হা/৩৩৮; তিরমিযী হা/২৭৯৩)*। নববী (রহঃ) বলেন, 'সুতরাং যদি তাদের উভয়ের মাঝে কোন আড়াল বা বাধা না থাকে, তবে তা হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে *(শরহু মুসলিম ৪/৩১)*। অতএব আলাদা বিছানায় ঘুমানো উত্তম। তবে স্থান সংকটের কারণে একই বিছানায় পৃথক পোষাকে ঘুমাতে পারে।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : বর্তমানে আমের পাইকারী ব্যবসায়ীরা সাধারণত ৪৮ কেজিকে এক মণ ধরে আম ক্রয় করেন। কিন্তু বিক্রয়ের সময় ৪০ কেজিকে এক মণ হিসাবে বিক্রি করেন। তাদের দাবী, সংরক্ষণ ও পরিবহনের কারণে আমের ওযন কমে যায়। এভাবে এক হিসাবে ক্রয় করে ভিন্ন হিসাবে বিক্রয় করা কি শরী'আতসম্মত?

-যাকারিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ক্রয়ের সময় ৪৮ কেজি এবং বিক্রয়ের সময় ৪০ কেজিকে এক মণ হিসাবে গণ্য করা হারাম নয়, যদি উভয় লেনদেনের সময় ব্যবহৃত একক, প্রকৃত ওযন ও মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট থাকে এবং কোন পক্ষকে বিভ্রান্ত করা না হয়। তবে মণ শব্দের প্রচলিত অর্থ ব্যবহার করে এক

পক্ষকে ৪০ কেজি এবং অন্য পক্ষকে ৪৮ কেজির হিসাব গোপনে চাপিয়ে দেওয়া প্রতারণা ও ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : নিফাস শেষ হওয়ার পর তা সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে যদি ২-৩ ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়, তাহ'লে সেগুলো কি পরে আদায় করতে হবে? এছাড়া যদি গভীর রাতে হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া যায়, তাহ'লে তখনই গোসল করে এশার ছালাত আদায় করা আবশ্যক, নাকি ফজর পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে?

-সালমা অখতার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রথমত যদি কোন নারী নিফাস শেষ হওয়া বুঝতে না পারার কারণে ২-৩ ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করেন, তাহ'লে তিনি যখন নিশ্চিতভাবে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি জানতে পারবেন, তখন ঐ ছালাতগুলোর ক্বাযা আদায় করবেন। কারণ পবিত্র হওয়ার পর থেকেই ছালাত ফরয হয়ে যায়। অজ্ঞতা বা ভুলবশত সময়মতো আদায় না করলে স্মরণ হওয়ার পর তা আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ছালাত ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে যায়, তার কাফফারা হ'ল যখন স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করা *(মুসলিম হা/৬৮৪; মিশকাত হা/৬০৩)*। নববী বলেন, হায়েয বন্ধ হওয়া এবং পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার লক্ষণ হ'ল: রক্ত নিঃসরণ এবং হলুদ ও ঘোলাটে স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সুতরাং যখন এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সে মহিলা পবিত্র বলে গণ্য হবে, চাই এরপর সাদা স্রাব বের হোক কিংবা না হোক *(আল-মাজমূ' ২/৫৬২)* দ্বিতীয়ত যদি ফজরের আগে, এমনকি গভীর রাতেও হায়েয বা নিফাস শেষ হয়ে যায় এবং এশার সময় তখনো অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে গোসল করে এশার ছালাত আদায় করবে। ফজর পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়। কারণ পবিত্র হওয়ার পর ছালাতের সময় অবশিষ্ট থাকলে তা আদায় করা ফরয। আর যদি ফজরের ওয়াক্তে পবিত্র হন এবং এশার সময় ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কেবল ফজরের ছালাত আদায় করবেন *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ১/২৮৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : ফরয ছালাত ও অন্যান্য যেকোন ছালাতের পর একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? হাত তুলে দো'আ করার বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে কি?

-শিহাব চৌধুরী, দিনাজপুর।

উত্তর : যেকোন ছালাতের পর একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে। তবে এটা নিয়ম বানিয়ে নেওয়া যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম যে ইবাদত যে স্থানে নিয়মিত করেননি বা করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেননি তা নিয়মিত করা যাবে না। বরং সাধারণভাবে করবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৬৮)*। আর হাত তুলে দো'আ করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের রব অত্যন্ত লজ্জাশীল ও মহান দাতা। বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তিনি তা শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন' *(আবুদাউদ হা/১৪৮৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২২৪৪)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : বিতরের ছালাতে দো'আ কুনূতের সঙ্গে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত অন্য কোন দো'আ পাঠ করা যাবে কি?

-মোস্তাফীযুর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর : কুনূতে বর্ণিত মাসনূন দো'আর সঙ্গে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির উপযোগী অতিরিক্ত দো'আ যোগ করা যায়। কেননা এটি মূলত দো'আর স্থান, আর দো'আর বিষয়টি ব্যাপক। নববী (রহঃ) বলেন, কুনূতের দো'আ সীমাবদ্ধ নয়। যারা সীমাবদ্ধ বলেছেন তারা ভুল বুঝেছেন *(আল-মাজমূ' ৩/৪৪৭-৪৮)*। উছায়মীন বলেন, এর সঙ্গে (মাসনূন কুনূতের দো'আর সঙ্গে) আরও কিছু দো'আ যোগ করলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটি দো'আর স্থান *(আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৫২)*। সুতরাং কুনূতের দো'আর সঙ্গে ছালাতে বৈধ এমন যেকোন দো'আ সংযোজন করা জায়েয *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৪/৬৩)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : কোন ব্যক্তি যদি বারবার মদ্যপান করে তাহ'লে তাকে কি হত্যা করতে হবে, যেমন আবুদাউদের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে?

রিয়ায, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার পান করলে বেত্রাঘাত কর। আবার পান করলে বেত্রাঘাত কর। এরপরও যদি পান করে, তবে তাকে হত্যা কর' *(আবুদাউদ হা/৪৪৮২, সনদ ছহীহ)*। উক্ত হাদীছটি নিম্নের হাদীছ দ্বারা মানসূখ হয়েছে। উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করার পর ক্বাবীছা (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে নবী করীম (ছাঃ) এর নিকট এক লোককে আনা হ'ল, যে মদ পান করেছিল; তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন। এরপর তাকে আবার আনা হ'লে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন। পুনরায় আনা হ'লে তিনি আবার বেত্রাঘাত করলেন। তারপর চতুর্থবার তাকে আনা হ'লে তিনি আবারও বেত্রাঘাত করলেন এবং মৃত্যুদণ্ড তুলে নিলেন। আর এটি মুসলিমদের জন্য একটি ছাড় হিসাবে গণ্য হ'ল *(আবুদাউদ হা/৪৪৮৫, সনদ দুর্বল)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, বারবার মদ্যপানের কারণে মৃত্যুদণ্ডের বিধানটি এই হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছের দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। আর আমার জানা মতে, এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(কিতাবুল উম্ম ৭/৩৬৫)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ বিধান ইসলামের প্রাথমিক দিকে ছিল। পরবর্তীকালে তা রহিত করা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১৪৪৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে বিচারক মনে করলে তা'যীর বা শাস্তি হিসাবে মারাত্মক ও নিয়মিত মদ্যপানকারীকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে *(আলবানী, ছহীহাহ হা/১৩৬০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : জানাযার ছালাত মসজিদে পড়ানো জায়েয কি? মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বায় বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ)-এর জানাযার ছালাত মসজিদে পড়ানো হয়েছিল। এ বর্ণনাটি কি ছহীহ এবং এ বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের ব্যাখ্যা কি?

-শাহীদুল ইসলাম, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : মসজিদের মধ্যে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন মসজিদে

নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবু ওয়াককাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩, মিশকাত হা/১৬৫৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮২)*। কিছু লোক মসজিদে জানাযার ছালাত আদায়ে আপত্তি জানালে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুহায়েল বিন বায়যা ও তার ভাই সাহলের জানাযা মসজিদে নববীতে আদায় করেছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩; মিশকাত হা/১৬৫৬)*। ইমাম আবূদাউদ (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন, 'মসজিদে জানাযার ছালাত আদায়ের বিধান'। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছটি পেশ করেন *(আবুদাউদ হা/৩১৮৯-৯০)*। আর নু'মান বিন বাশীরের জানাযা আয়েশা (রাঃ) মসজিদে পড়েছেন, এটা পুরোপুরি ভুল। কারণ আয়েশা (রাঃ) মারা যান ৫৭ হিজরীতে এবং নূমান বিন বাশীর শাহাদাত বরণ করেন ৬৪ হিজরীতে *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ৬/৩৪৭)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদের ভেতরে জানাযার ছালাত আদায় করল, তার জন্য কোন ছওয়াব নেই *(আবুদাউদ হা/৩১৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৫১৭, সনদ হাসান, আলবানী)*। প্রথমত উক্ত হাদীছ ছহীহ নয় *(আরনাউত্ব, আহমাদ হা/৯৭২৮, ১০৫৬৮)*। দ্বিতীয়ত বর্ণনাটি ছহীহ ধরা হ'লে এর অর্থ হবে মসজিদে জানাযা আদায় করার কারণে তার অতিরিক্ত কোন ছওয়াব নেই *(ছহীহাহ হা/২৩৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : মায়ের মামা তথা নানীর আপন ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ বাসসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : নানীর ভাই বা বোনকে বিবাহ করা যাবে না। কারণ তারা স্থায়ী মাহরামের মধ্যে গণ্য *(নিসা ৪/২৩)*। তাছাড়া মায়ের মামা নিজ মামার মতোই গণ্য হন। ফলে তিনি বংশগত সূত্রে ঐ নারীর জন্য স্থায়ী মাহরাম হিসাবে পরিগণিত হবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৩৮৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে করণীয় কি?

-রোকসানা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় অনুতপ্ত হয়ে *'ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন'* পড়া যায় *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। সেই সাথে সতর্ক থাকতে হবে যেন এমনটি পুনরায় আর না ঘটে। উল্লেখ্য যে, পড়ে গেলে তুলে চুমো দেওয়া বা চাল বিতরণ করা ভিত্তিহীন প্রথা মাত্র।

***প্রশ্ন (৩০/৪৭০) :* আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ জায়গায় টোল নেয়া হয়, হিজড়ারা কিংবা কিছু মানুষ হাতির মাধ্যমে জোর করে চাঁদা আদায় করে। এদের চাঁদা দেওয়ার বিধান কী? না দিলে কি গোনাহ হবে? চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা হ'লে করণীয় কি?**

-আব্দুল মালেক, নওদাপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জোরপূর্বক, ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা রাস্তা আটকে টাকা আদায় করে, তাহ'লে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ এবং এক প্রকার যবরদস্তি ও চাঁদাবাজি। এ ধরনের চাঁদা দাবী করা হারাম। আবার স্বেচ্ছায় তাদের এ কাজকে সমর্থন করে চাঁদা দেওয়া বৈধ নয়। কিন্তু যবরদস্তি, মারধর, ক্ষতি বা বড় ধরনের অনিষ্টের আশঙ্কায় আত্মরক্ষার জন্য টাকা দিতে হ'লে দাতার কোন গোনাহ নেই। গোনাহ হবে অন্যায়ভাবে আদায়কারীর' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩১/২৮৭; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তোহফাতুল আহওয়াযী ৪/৪৭১)*। আর সরকার বা বৈধ কর্তৃপক্ষ সেতু, মহাসড়ক বা নির্দিষ্ট অবকাঠামো ব্যবহারের বিনিময়ে যে নির্ধারিত টোল বা ফি গ্রহণ করে, তা বৈধ বা জায়েয। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বৈধ অনুমোদন ছাড়া রাস্তা আটকে অর্থ আদায় করলে তা যবরদস্তিমূলক চাঁদাবাজি হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : হাদীছে হাফেয হওয়ার যে মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, তা কি যেকোন পরিমাণ হিফযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না কেবল পুরো কুরআন হিফয করলেই সেই মর্যাদা লাভ করা যাবে? ভালো হাফেয তৈরীর উদ্দেশ্যে সন্তানকে কোন বিদ'আতী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাকিব, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত কুরআন হিফযের পূর্ণ ফযীলত পেতে হ'লে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে হবে। কেউ যদি পুরো কুরআন হিফয না করে কিছু অংশ হিফয করেন, তিনিও হিফয করা অংশের কারণে ছওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবেন। কিন্তু যে মর্যাদা বা বিশেষ উপাধি সম্পূর্ণ কুরআনের হাফেয হওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেটি আংশিক হিফয দ্বারা অর্জিত হবে না *(মির'আত ৭/২০৯; তোহফাতুল আহওয়াযী ৮/১৮৭)*। দ্বিতীয়ত সন্তানকে কুরআনের ভালো হাফেয বানানো অবশ্যই প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু কোন বিদ'আতী প্রতিষ্ঠানে তাকে ভর্তি করে সেই লক্ষ্য অর্জন করা শরী'আতসম্মত হবে কি-না, তা নির্ভর করবে সেখানে প্রচলিত বিদ'আত ও তার প্রভাবের ওপর। মূলনীতি হ'ল ভালো উদ্দেশ্য হারাম বা অবৈধ পদ্ধতিকে বৈধ করে না। সন্তানকে কুরআন হিফয করানোর পাশাপাশি তাকে ছহীহ আক্বীদা ও সুন্নাতসম্মত দ্বীনী শিক্ষা দেয়া পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : কোন মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সালাম ফেরানোর পর নিজের ছালাত পূর্ণ করার সময়, পরে আগত অন্য কোন ব্যক্তি কি তার ইমামতিতে জামা'আতে শরীক হ'তে পারবেন?

-কায়েদ মাহমূদ ইমরান, বরিশাল।

উত্তর : কোন মাসবূক ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে তার পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ ছালাতের শুরু থেকেই ইমামতির নিয়ত থাকা শর্ত নয়। তাছাড়া একজন ছালাত আদায়কারী একাকী অবস্থা থেকে ইমামে রূপান্তরিত হওয়া, ইমাম থেকে মুক্তাদীতে রূপান্তরিত হওয়া এবং এর বিপরীত হওয়া জায়েয হওয়ার বিশুদ্ধ দলীল রয়েছে *(আহমাদ হা/১৯১২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৪৮; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/৩০৮-৩১০)*। তবে মাসবূকের অনুসরণ না করে আলাদাভাবে অন্য ইমামের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করাই উত্তম *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দরে সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য যৌথ ইবাদতখানা রাখা হয়, যেখানে কোন পৃথক ব্যবস্থা থাকে না। আবার কোন কোন প্রেয়ার রুমে বাইবেল, গীতা প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থও রাখা থাকে। এ ধরনের

প্রেয়ার রুমে মুসলিমদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হারূনুর রশীদ, খুলনা।

উত্তর : যদি কোন কক্ষে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা ইবাদত করে, কিন্তু সেখানে ক্রুশ, মূর্তি, দেব-দেবীর ছবি বা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতীক স্থাপন করা না থাকে, তাহ'লে সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয। স্থায়ী মসজিদ বা মুসলিমদের জন্য পৃথক ছালাতের স্থান না পাওয়া গেলে, অমুসলিমদের সঙ্গে একই ছাদের নীচে হ'লেও সেখানে ইবাদত জায়েয মর্মে বিদ্বানগণ একমত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৮০-৮১)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : বিয়ের সময় আমার শাশুড়ী আমাকে একটি স্বর্ণের হার উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছর পর তিনি সেটি ফেরত চাইছেন। এ অবস্থায় উপহার হিসাবে পাওয়া বস্তু কি ফেরত দিতে বাধ্য, নাকি তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানানো যাবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : উপহার দিয়ে তা ফেরত নেয়া জায়েয নয়। কেবল পিতামাতা তার সন্তানকে দেওয়া উপহার ফেরত চাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য তার দেওয়া দান বা উপহার ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়; তবে পিতা তার সন্তানকে যা দিয়েছেন, তা ব্যতীত *(আবুদাউদ হা/৩৫৩৯; মিশকাত হা/৩০২১, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি তার উপহার ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে আবার নিজের বমি চেটে খায়' *(বুখারী হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৩০১৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : মানুষের শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা কি নাপাক গণ্য হবে? এ অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এরূপ অল্প রক্ত নির্গত হ'লে এবং শরীরে বা পোষাকে লাগলে তা নাপাক হবে না। বরং এরূপ অবস্থায় ছালাত আদায় করবে। শায়েখ বিন বায বলেন, শরীর থেকে বেশী রক্ত গড়িয়ে পড়লে তা বন্ধ হওয়ার পর সতর্কতা হিসাবে নতুন করে ওযূ করে নেওয়াই উত্তম। আর রক্তের পরিমাণ যদি সামান্য বা কম হয়, তবে তা কেবল মুছে ফেললেই যথেষ্ট হবে; এর ফলে ওযূ ভাঙবে না এবং তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/১৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : একটি হাদীছে এসেছে, যে নারীর প্রথম সন্তান কন্যা হয়, তিনি অধিক বরকতময়। এ হাদীছটি কতটুকু ছহীহ? হাদীছটির সঠিক ব্যাখ্যা কি?

-মারিয়া, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৫২৯৩)*। তবে কন্যা সন্তান লালন পালনের ফযীলতে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কাউকে যদি কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল বা ঢাল হয়ে দাঁড়াবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : আমার পিতা-মাতা আমার আক্বীক্বা না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এ অবস্থায় আমি নিজের পক্ষ থেকে আক্বীক্বা করতে পারব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাউদ হা/২৮৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের আক্বীক্বাও সপ্তম দিনে করেছিলেন *(ছহীহ ইবনু হিববান হা/৫৩১১, সনদ হাসান)*। অতএব সক্ষম ব্যক্তি সপ্তম দিনেই আক্বীক্বা করবে। এক্ষণে পিতামাতা সন্তানের আক্বীক্বা না করে থাকলে সন্তান নিজের আক্বীক্বা নিজেই করবে *(ছহীহাহ হা/২৭২৬)*। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, 'আমি যদি জানতে পারতাম যে আমার পক্ষ থেকে আক্বীক্বা করা হয়নি, তবে আমি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে আক্বীক্বা করতাম' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪২৩৬; বিস্তারিত দ্র. 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা' বই)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : বিয়ের পর স্ত্রী যদি পাগল হয়ে যায় এবং বন্ধ্যা হয়, তাহ'লে শুধু এ কারণেই তাকে তালাক দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল আহাদ, নোয়াখালী।

উত্তর : এরূপ নারীদের মানবিক কারণে তালাক দেওয়া উচিৎ নয়। বরং তাদের নিরাপদে রেখে প্রয়োজনে একাধিক বিয়ে করবে। তালাককে ইসলামে নিকৃষ্টতম হালাল বলা হয়েছে *(আবুদাউদ হা/২১৭৮; মিশকাত হা/৩২৮০, মর্ম ছহীহ)*। তবে স্বামী বিশেষ কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে *(ছহীহাহ হা/২০০৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অল্পবয়সী কুমারী মেয়ের বিবাহে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বাধা আছে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বাধা নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স যখন ৫২-৫৩ বছর তখন তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। এসময়ে আয়েশা (রাঃ)-এর ছিল মাত্র ৬-৭ বছর *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/১৩৮)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : আযান ব্যতীত ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?

-ড. আযীযুল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা বা ফরযে কেফায়াহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড়, সে তোমাদের ইমামতি করবে' *(বুখারী হা/৬২৮; মিশকাত হা/৬২৩)*। তবে আযান বা ইক্বামত ছাড়া কেউ ছালাত আদায় করলেও ছালাত হয়ে যাবে। আসওয়াদ ও আলক্বামা (রহঃ) বলেন, আমরা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিছনে কি তারা ছালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো। কিন্তু তিনি আমাদের আযান কিংবা ইক্বামতের নির্দেশ দেননি *(মুসলিম হা/৫৩৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৬/৩৩৩; নববী, শরহ মুসলিম উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা)*।

YEAR TABLE (29th Vol.) বর্ষসূচী-২৯ (Oct. 2025 to Sept. 2026)

(২৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২৫ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)

▣ **সম্পাদকীয় :** **১.** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ করুন! *(অক্টোবর'২৫)* **২.** কুফরীর সাথে ইসলামের কোন আপোষ নেই *(নভেম্বর'২৫)* **৩.** ভূমিকম্প : সতর্কবার্তা ও আত্মশুদ্ধিতার আহ্বান *(ডিসেম্বর'২৫)* **৪.** বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ধারণ করুন! *(জানুয়ারী'২৬)* **৫.** লক্ষ্যহীন গতানুগতিক নির্বাচন *(ফেব্রুয়ারী'২৬)* **৬.** ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও আগামীর গন্তব্য *(মার্চ'২৬)* **৭.** মিডিয়া, মতাদর্শ ও সমাজ গঠনের লড়াই *(এপ্রিল'২৬)* **৮.** আদর্শিক নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা *(মে'২৬)* **৯.** সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও আমাদের আত্মপরিচয়ের লড়াই *(জুন'২৬)* **১০.** মানবতার বিপর্যয় : ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছার অপরিহার্যতা *(জুলাই'২৬)* **১১.** দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা : সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি ও আমাদের প্রত্যাশা *(আগস্ট'২৬)* **১২.** মক্কা চুক্তি : মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সম্মিলিত নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত *(সেপ্টেম্বর'২৬)*।

▣ **দরসে কুরআন :** **১.** মুনাফিকের পরিচয় ও আলামত *(অক্টোবর'২৫) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **২.** কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক রাজনীতি *(নভেম্বর'২৫) -ঐ* ।

▣ **দরসে হাদীছ :** **১.** গোরাবা কারা? *(অক্টোবর'২৫) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **২.** মানুষের সন্তুষ্টি বনাম আল্লাহ্র সন্তুষ্টি *(নভেম্বর'২৫) -ঐ* **৩.** নেতৃত্বের লোভ *(ডিসেম্বর'২৫) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

▣ **প্রবন্ধ : (১) অক্টোবর'২৫ :** **১.** বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় রীতি-নীতি *(পূর্বে প্রকাশিতের পর) (২৯/১) - মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **২.** দ্বীনী খেদমত : কৃতিত্ব নয় সৌভাগ্য *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **৩.** ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম *(২৯/১-২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(২) নভেম্বর'২৫ : **১.** কর্মময় ও বরকতপূর্ণ জীবন গঠনের উপায় *–ড. ইহসান ইলাহী যহীর* **২.** দ্বীনদার জীবনসঙ্গী লাভের উপায় ও করণীয় *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*।

(৩) ডিসেম্বর'২৫ : **১** ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করবেন যেভাবে *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **২.** মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য *(২৯/৩-৪) -মুহাম্মাদ রাফাত আনাম*।

(৪) জানুয়ারী'২৬ : **১.** আধুনিক শিক্ষা কাঠামোতে হাদীছ পাঠদানের উদ্ভাবনী পন্থা *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **২.** আধুনিক সমাজে তাওহীদী চেতনার গুরুত্ব *-আব্দুল্লাহ বিন বেলাল* **৩.** ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করবেন যেভাবে *(পূর্ব প্রকাশিতের পর) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৪.** আন্তঃধর্ম সংলাপ : একটি গভীর ষড়যন্ত্র *-সাজিদুর রহমান*।

(৫) ফেব্রুয়ারী'২৬ : **১.** রামাযান মাসের ফাযায়েল ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **২.** ইসলামে একাধিক বিবাহ : বিধান, তাৎপর্য ও শর্তাবলী *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **৩.** যেমন ছিল সালাফদের রামাযান *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৪.** জুম'আর দিনের মর্যাদা : করণীয় ও বর্জনীয় *-মুহাম্মাদ রাফাত আনাম*।

(৬) মার্চ'২৬ : **১.** যাকাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও তা আদায় না করার পরিণতি *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **২.** শাওয়াল মাসের করণীয় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **৩.** ঈদুল ফিৎর নিছক আনন্দ নয় ইবাদত *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৪.** লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত লাভের উপায় *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৫.** পারস্পরিক দূরত্ব ও মান-অভিমান নিরসনের কার্যকর উপায় ও কৌশল *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*।

(৭) এপ্রিল'২৬ : **১.** রিয়া : কারণ ও প্রতিকার *(২৯/৭-৮) -ড. নূরুল ইসলাম* ২. হাদীছ ও সুন্নাহ্র মধ্যে পৃথকীকরণের চেষ্টা : একটি পর্যালোচনা *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** কিভাবে অন্তরকে মসজিদমুখী করবেন? *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৪.** মিসওয়াকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*।

(৮) মে'২৬ : **১.** হজ্জ সফরে ধৈর্যের পরীক্ষা *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **২.** যেমন ছিল সালাফদের হজ্জ-ওমরাহ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৯) জুন'২৬ : **১.** রিয়া-র ভয়াবহতা ও ক্ষতি *-ড. নূরুল ইসলাম* **২.** ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ : আত্মশুদ্ধির সোপান ও প্রশান্তির চাবিকাঠি *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **৩.** গোপন পাপ : ঈমান বিধ্বংসী এক নীরব ঘাতক *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(১০) জুলাই'২৬ : **১.** রিয়া-র বিধিবিধান *-ড. নূরুল ইসলাম* **২.** গোপন পাপ থেকে বাঁচার উপায় *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক দিক-নির্দেশনা *-রাফাত আনাম* **৪.** শী'আ মতবাদ ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা *-মুজাহিদুল ইসলাম*।

(১১) আগস্ট'২৬ : **১.** আযান ও ইক্বামতের গুরুত্ব ও ফযীলত *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **২.** ফজর ছালাত : গুরুত্ব ও ফযীলত *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** মার্কসের দর্শন বনাম ইসলাম : ভ্রান্ত তত্ত্ব বনাম শাশ্বত সত্য *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৪.** আহলে বায়ত : পরিচয় ও মর্যাদা *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

(১২) সেপ্টেম্বর'২৭ : **১.** সালাফে ছালেহীন যেভাবে রিয়া থেকে বেঁচে থাকতেন *-ড. নূরুল ইসলাম* **২.** ডারউইনবাদ : বিজ্ঞানের আড়ালে নাস্তিকতার রাজনীতি *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** হাদীছ অনুযায়ী আমল *-মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী* **৪.** ফজর ছালাতের গাফিলতি : পরিণাম ও প্রতিকার *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৫.** জবাবদিহিতা : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের *-মামূন বিন হাশমত*।

▣ **প্রচ্ছদ রচনা :** **১.** পূজামণ্ডপ পাহারা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *(নভেম্বর'২৫) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **২.** সুদানে গণহত্যা : বন্ধ হোক ক্ষমতার লড়াই *(ডিসেম্বর'২৫) -আত-তাহরীক ডেস্ক* **৩.** আর কত রক্ত প্রয়োজন? কবে আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা? *(জানুয়ারী'২৬) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **৪.** ক্ষমতার দম্ভে অবরুদ্ধ মানবতা : মুসলিম বিশ্বের করণীয় *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -ঐ* **৫.** ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : একটি বিশ্লেষণ *(মার্চ'২৬) -ঐ* **৬.** জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাতছানি *(এপ্রিল'২৬) -ঐ* **৭.** হজ্জের অন্তর্নিহিত তাৎপয *(মে'২৬) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৮.** আশূরা উপলক্ষে শী'আদের বিকৃত শোকসংস্কৃতি *(জুন'২৬) -ঐ* **৯.** ইসলামী বিচারব্যবস্থা কি মধ্যযুগীয়? তথাকথিত আধুনিকতা বনাম এলাহী সমাধান *(জুলাই'২৬) -ঐ* **১০.** বাংলাদেশের বন্যা : বাস্তবতা ও করণীয় *(আগস্ট'২৬) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*।

▣ **সময়ের ভাবনা :** **১.** আদর্শের কোন বিকল্প হয় না *(মার্চ'২৬) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **২.** বিশ্বকাপের মোহে বেহুঁশ তারুণ্য : একটি আত্মজিজ্ঞাসা *(আগস্ট'২৬) -মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান*।

▣ **অর্থনীতির পাতা :** **১.** তাওহীদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : বিশ্বাস ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব *(মে'২৬) -আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক*।

▣ **দিশারী :** **১.** জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ : একটি বিশ্লেষণ *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **২.** ছালাত ক্বছর ও জমা করার বিধান : একটি পর্যালোচনা *(এপ্রিল'২৬) -ঐ* **৩.** দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর শারঈ বিধান : একটি পর্যালোচনা *(জুন'২৬) -ঐ*।

▣ **ছাহাবী চরিত :** **১.** ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) *(২৯/১০-১১) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*।

▣ **আত্মচিন্তা :** **১.** দুনিয়ার খেলাঘর *(ডিসেম্বর'২৫) -সারওয়ার মিছবাহ* **২.** ইবাদতে লৌকিকতা *(জানুয়ারী'২৬) -ঐ* **৩.** অধিনস্থদের প্রতি ইহসান *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -ঐ* **৪.** আল্লাহকে ভালোবাসি *(জুন'২৬) -ঐ*।

▣ **শিক্ষাঙ্গন :** **১.** শিক্ষকতায় মু'আশারাত *(অক্টোবর'২৫) -সারওয়ার মিছবাহ* **২.** দাওরাতুল হাদীছ : চূড়ান্ত প্রস্তুতির স্থান *(নভেম্বর'২৫) -ঐ মিছবাহ* **৩.** কি পড়ব? কিভাবে পড়ব? *(ডিসেম্বর'২৫) -ঐ* **৪.** আদর্শ অভিভাবক *(জানুয়ারী'২৬) -ঐ* **৫.** শিক্ষা সহজীকরণ *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -ঐ* **৬.** শিক্ষার্থীর রামাযান *(মার্চ'২৬) -ঐ* **৭.** রোজনামচা : লেখালেখির হাতেখড়ি *(এপ্রিল'২৬) -ঐ* **৮.** প্রবন্ধ রচনা : কলাকৌশল ও চর্চা *(মে'২৬) -ঐ* **৯.** প্রাইভেট নাকি সেল্ফ এডুকেশন *(জুন'২৬) -ঐ* **১০.** আসুন, মানুষ গড়ি! *(জুলাই'২৬) -ঐ* **১১.** এডুকেশন বিজনেস *(আগস্ট'২৬) -ঐ* **১২.** আদর্শের শক্তিতে নিয়মের পূর্ণতা *(সেপ্টেম্বর'২৬) -ঐ*।

▣ **সাহিত্যাঙ্গন :** **১.** আত্মার দিনলিপি *(এপ্রিল'২৬) -মুহাম্মাদ মুবাশ্শিরুল ইসলাম*।

▣ **সন্তান পরিচর্যা :** **১.** পরিবারে অগ্রাধিকার ব্যবস্থাপনা *(অক্টোবর'২৫) -জাহিদ হাসান* **২.** উঠতি বয়সে বন্ধু-বান্ধবজনিত সমস্যা : উত্তরণের পথ *(নভেম্বর'২৫) -মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* **৩.** শিশুদের আদব : পারিবারিক শিক্ষার প্রথম পাঠ *(ডিসেম্বর'২৫) -ঐ* **৪.** আগামীর নক্ষত্র গড়ে উঠুক বিনয়ের আলোয়! *(জানুয়ারী'২৬) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **৫.** শিশুদের ছিয়াম : কেন, কখন ও কিভাবে অভ্যস্থ করবেন? *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* **৬.** ভাই-বোনদের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়করণ ও হিংসা দূরীকরণে করণীয় *(মার্চ'২৬) -ঐ* **৭.** সন্তান আমার আয়না *(আগস্ট'২৬) -জাহিদ হাসান* **৮.** ঘুমহীন রাত, বিধ্বস্ত প্যারেন্টিং *(সেপ্টেম্বর'২৬) -ঐ*।

▣ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :** **১.** ঐতিহাসিক বাগদাদের মর্মান্তিক পতন *(ডিসেম্বর'২৫) -মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ* **২.** যুগে যুগে কুরবানী : আত্মত্যাগের চিরন্তন ইতিহাস *(মে'২৬) -ঐ*।

▣ **মহিলা অঙ্গন :** **১.** স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্য জীবনের সোপান *(অক্টোবর'২৫ ২৯/১-২) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** নারীর ভরণ-পোষণের বিধান ও ফযীলত *(ডিসেম্বর'২৫) -ঐ* **৩.** ইসলামে শাশুড়ি ও পুত্রবধুর সম্পর্ক *(জানুয়ারী'২৬) -ঐ* । **৪.** আমরা কেন তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হই? *(জুলাই'২৬) -আয়েশা হুমায়রা*।

▣ **নবীনদের পাতা :** **১.** ছিয়ামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -আরাফাত যামান* **২.** ইন্টারনেট ব্যবহারে সতর্কতা *(জুন'২৬) -হাসীবুর রশীদ* **৩.** স্মার্টফোন আসক্তি : সময় ও মেধার নীরব ঘাতক *(আগস্ট'২৬) -ঐ*।

▣ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** **১.** স্বামীর জীবনে নেককার স্ত্রীর প্রভাব *(জুলাই'২৬) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **২.** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দৃঢ়তা *(আগস্ট'২৬) -ড. নূরুল ইসলাম* **৩.** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আবুবকর ও ওমর (রাঃ) *(সেপ্টেম্বর'২৬) -ঐ*।

▣ **করণীয়-বর্জনীয় :** **১.** বর্ষবরণ উৎসব ও বিজাতীয় সংস্কৃতির থাবা *(এপ্রিল'২৬) -মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* **২.** তাহিইয়াতুল মাসজিদ আদায়ে অভ্যস্ত হৌন! *(জুন'২৬) -ড. ইহসান ইলাহী যহীর*।

▣ **দো'আ ও যিকর :** **১.** নিঃস্বের আর্তনাদ ও এলাহী সাহায্য : মূসা (আঃ)-এর ঐতিহাসিক দো'আ *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **২.** ক্ষমার চাদরে নিজেকে জড়ানোর আকুতি : আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন... *(মার্চ'২৬) -ঐ* **৩.** কিছু হারানোয় বা যেকোন বিপদে মুমিনের সান্ত্বনা : এক অনন্যসাধারণ দো'আ *(জুন'২৬) -ঐ* **৪.** যে দো'আটিতে লুকিয়ে আছে জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া *(জুলাই'২৬) -ঐ*।

▣ **হাদীছের গল্প :** **১.** রাসূলের আতিথেয়তা ও মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন *(অক্টোবর'২৫) -আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ*।

▣ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** **১.** পথহারা পথিক যেভাবে আলোর পথে *(অক্টোবর'২৫) -সাজিদুর রহমান* **২.** উত্তম ফায়ছালা *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -শিহাব চৌধুরী বিন দুলাল* **৩.** হালাল রিযিকের চাবিকাঠি : আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্টি ও ধৈর্য *(মার্চ'২৬) -হাসীবুর রশীদ* **৪.** মানুষ *(সেপ্টেম্বর'২৬) -মুস্তাফীযুর রহমান*। ▣ **সালাফদের জীবন থেকে :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (নভেম্বর'২৫)*।

▣ **চিকিৎসা জগৎ :** **১.** হামের প্রাদুর্ভাব : কারণ, লক্ষণ ও করণীয় *(মে'২৬) -ডা. মেহেদী হাসান মনিম*।

▣ **স্বাস্থ্যকথা :** **১.** নীরব ঘাতক হাঁটু ক্ষয় : প্রতিরোধের উপায় *-আত-তাহরীক ডেস্ক (অক্টোবর'২৫)* **২.** নীরব প্রহরী কিডনী : সুস্থ রাখতে করণীয় *(নভেম্বর'২৫)* **৩.** রামাযানে ছায়েমদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরামর্শ *(ফেব্রুয়ারী'২৬) -ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ* **৪.** সফরকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা *(মার্চ'২৬) -ঐ* **৫.** টুথব্রাশ ব্যবহারে অসাবধানতায় হ'তে পারে হৃদরোগ ও ডায়বেটিস *(সেপ্টেম্বর'২৬)*।

▣ **ক্ষেত খামার :** বাংলাদেশে প্যাপেইন উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক রূপরেখা *(জুলাই'২৬)*।

▣ **বিশেষ সংবাদ :** **১.** সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী ও দীর্ঘ ৩৪ বছরের হজ্জের খতীব শায়েখ আব্দুল আযীয আলে-শেখ-এর মৃত্যু *(নভেম্বর'২৫)* **২.** সঊদী আরবের নতুন গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ ছালেহ বিন ফাওযান বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাওযান *(ডিসেম্বর'২৫)* **৩.** মারকায পরিদর্শনে সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেম শায়খ ফুআদ আব্দুর রহমান আর-রশীদ *(ফেব্রুয়ারী'২৬)* **৪.** চলে গেলেন প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী (রহ.) *(জুন'২৬)* **৫.** আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থাপন *(জুলাই'২৬)* **৬.** দীর্ঘ ২৫ বছর পর উদ্ধার হ'ল বগুড়াস্থ নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স *(জুলাই'২৬)* **৭.** নতুন প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ *(আগস্ট'২৬)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয়-১২টি **২.** দরসে কুরআন-২টি **৩.** দরসে হাদীছ-৩টি **৪.** প্রবন্ধ-৪৩টি **৫.** প্রচ্ছদ রচনা-১০টি **৬.** সময়ের ভাবনা-২টি **৭.** অর্থনীতির পাতা-১টি **৮.** দিশারী-৩টি **৯.** ছাহাবী চরিত-১টি **১০.** আত্মচিন্তা-৪টি **১১.** শিক্ষাঙ্গন-১২টি **১২.** সাহিত্যাঙ্গন-১টি **১৩.** সন্তান পরিচর্যা-৮টি **১৪.** ইতিহাস-ঐতিহ্য-৮টি **১৫.** মহিলা অঙ্গন-৪টি **১৬.** নবীনদের পাতা-৩টি **১৭.** ইতিহাসের পাতা থেকে-৩টি **১৮.** করণীয়-বর্জনীয়-২টি **১৯.** দো'আ ও যিকর -৪টি **২০.** হাদীছের গল্প-১টি **২১.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান-৪টি **২২.** সালাফদের জীবন থেকে-১টি **২৩.** চিকিৎসা জগৎ-১টি **২৪.** স্বাস্থ্যকথা-৫টি **২৫.** কবিতা-৪০টি **২৬.** বিশেষ সংবাদ-৭টি **২৭.** প্রশ্নোত্তর-৪৮০টি। স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة

المجلد : ٢٩ العدد : ١٢، ربيع الأول و ربيع الآخر ١٤٤٨هـ/ سبتمبر ٢٠٢٦

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(বুখারী হা/৪৫০)*।

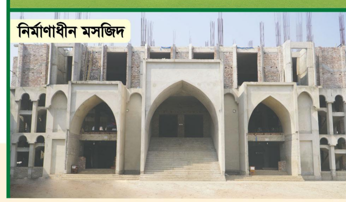

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ও গাঁথুনি সম্পন্ন হয়েছে গ্রীল, থাই, টাইলস, পেইন্ট ইত্যাদি বাকী আছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ

০১৭৭০-৮০০৯০০ | hadeethfoundationbd.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 12, September 2026

বাংলাদেশ আই হসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

Bangladesh EYE HOSPITAL Rajshahi Ltd. Eye Care, We Care

চোখের যত্নে বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল ‘বাংলাদেশ আই হসপিটাল’-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় **২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ**। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।

সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সাশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার, এয়ারপোর্ট রোড, আম চত্বর রাজশাহী

মোবাইল : ০৯৬৪৩১২৩১২৩

এম. এস. মানি চেঞ্জার

(M.S. MONEY CHANGER)

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

এখানে সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডলার, পাউন্ড, ইউরো, সউদী রীয়াল, কুয়েতি দিনার, রিংগিট ইত্যাদি এবং পাসপোর্ট ডলার এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

ঠিকানা : গনকপাড়া, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের নিচে, সাহেব বাজার, জিরোপয়েন্ট, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭৫৪১৪৮৪১২, ০১৭২৬৬৮৬৬৬৬

টেলিফোন : ২৫৮৮৮৫৫৯০২